

বিজ্ঞানবাণী

৩/১১

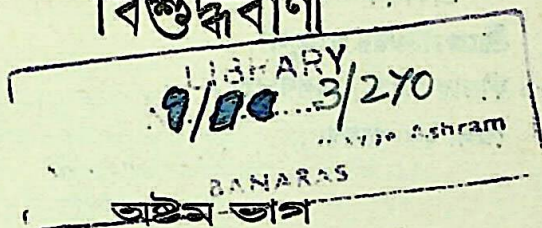
Y 3/270

১৯৩৮

অষ্টম ভাগ

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
সম্পাদিত

विशुद्धबानी



पद्मविभूषण

महागहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज, एम-ए, डि-लिट
सम्पादित

‘विशुद्धानन्द कानन’ आश्रम

मालदहिया, उकाशीधाम ।

सन १९५१ साल

सर्वसत्त्व संग्रहित]

[मूल्य दूई টাকা

SHK

প্রকাশক—

শ্রীজ্যোতির্নয় গাঙ্গুলী,
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
জেলা ২৪ পরগণা।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,
বিপ্লবানন্দ কানন, মালদহিয়া, বারাণসী।

অথবা

২ এ, সিগরা, বারাণসী।

২। জ্যোতির্নয় গাঙ্গুলী,
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
জেলা ২৪ পরগণা।

৩। শ্রীসরোজমোহন চট্টোপাধ্যায়,
বিপ্লব আশ্রম, বর্দ্ধমান।

৪। মহেশ লাইব্রেরী,
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

মুদ্রক—কমলা প্রেস,
বারাণসী।

9/178

3/270

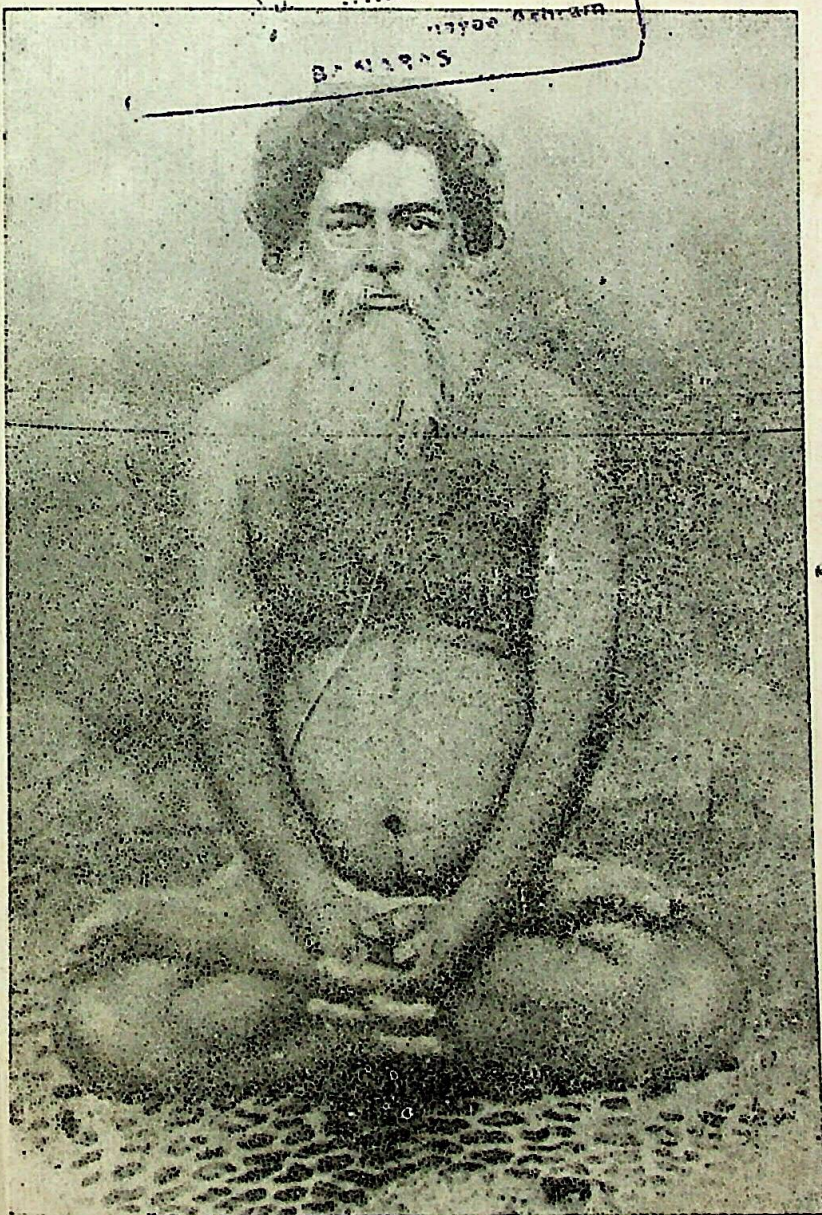
Sri Sri Anandamayee Ashram

VARANASI
মুদ্রিত

	পৃষ্ঠা
১। শক্তি-মাহাত্ম্য—শ্রী অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত	১
২। অলৌকিক দর্শন—শ্রী ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ	৫
৩। বিন্দুদর্শনের রহস্য—শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ	১০
৪। শ্রীশ্রীগুরু স্মরণে—শ্রী রাজবালা দেবী	১৫
৫। সিদ্ধভূমি—শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ	২৩
৬। শ্রীশ্রীগুরু-স্মরণে (কবিতা)—শ্রী মোহিনীমোহন সান্যাল	৩৮
৭। শ্রীশ্রীবিগ্ধানন্দ প্রসঙ্গ—শ্রী ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৯
৮। শ্রীশ্রীগুরুর মহিমা ও লীলা-কথা—	
শ্রী মোহিনীমোহন সান্যাল	৪৮
৯। অঘটন আজও ঘটে—শ্রী বিভাবতী রায়	৬১
১০। শ্রীগুরু-স্মৃতি ও কয়েকটি কথা—শ্রী যতীশচন্দ্র বসু	৬৭
১১। বাবার কৃপা—শ্রী শিবরাণী দাসী	৮৪
১২। গুরু-স্মৃতি—৩ বিভূতিভূষণ বিশ্বাস	৮৮
১৩। প্রার্থনা (কবিতা)—শ্রী প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	৯১
১৪। মানস পূজা—শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ	৯৩
১৫। আশ্রম গৌরব (কবিতা)—শ্রী অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত	১০৯
১৬। শ্রীগুরু-প্রসঙ্গ—৩ সুরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা	১১৫
১৭। জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণত্বলাভ-একটি দৃষ্টি—	
শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ	১২৭







যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিষ্ণুদ্বানন্দ পরমহংসদেব



3/270

৭/১১

বিশুদ্ধবাণী

অষ্টম ভাগ

শক্তি-মাহাত্ম্য

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

ইচ্ছতি ভুতি কলনাদ্ যদ্ অনুত্তরাং
যুক্তা শিবেন পরমেণ খলু স্বভজ্ঞা।
উন্মেষম্ অন্ত জগতো বিদধাসি সম্যক্
বিশ্বেশ্বরীতি কথিতাসি ততোহম্ব বিজ্ঞেঃ ॥১॥

মা, অনুত্তরা (উচ্চতম সত্যরূপা—the highest Reality) তুমি যে (নিজের মধ্যে) ইচ্ছারূপ ঐশ্বর্যের বিকাশ করিয়া স্বয়ং স্বাধীনা রহিয়াই পরম-শিবের সহিত যুক্ত হইয়া সম্যক্ রূপে এই জগতের উন্মেষের (সৃষ্টির, evolution এর) বিধান করিয়া থাক, সেইজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমাকে বিশ্বেশ্বরী বলেন ।* (তুমি নিজ অধিকারেই বিশ্বেশ্বরী ; বিশ্বেশ্বর বণিতা বলিয়া নহে ।)

* অদ্বৈত শৈব মতে পরমেশ্বরের বিশ্ব ব্যবস্থাপক শক্তি কলাপের মধ্যে তিনটি শক্তি মুখ্য—অনুত্তর, ইচ্ছা ও উন্মেষ—বাহাদের স্রোতক হইতেছে অ, ই, উ—এই তিনটি মুখ্য স্বরবর্ণ । এই তিনটি হইতেই বীজরূপে সকল স্বরবর্ণ ও যোনিরূপে সকল ব্যঞ্জনবর্ণ উদ্ভূত হইয়া জগৎ সৃষ্টির মূলীভূত মাতৃকা

দ্বং শক্তিরিভাভিহিতা ন জড়া তথা চ
 হীনাহসি শক্তিগত ইত্যবিকল্পনীয়া।
 ত্বান্ অন্তরেণ হি বভুঃ শবসম্মিতঃ স
 ঈশোহপ্যনৌশ ইতি বাচ্যভয়েব গণ্যঃ ॥২॥

শক্তি বলিয়া অভিহিত হইলেও তুমি জড় নও, এবং যিনি
 শক্তিমান্ (বলিয়া গণ্য) তাহা হইতে হীন একরূপ বিকল্পনারও
 যোগ্য নও। কেননা (ইহা স্বীকার্য্য যে,) তোমা হইতে বিযুক্ত
 হইলে শিব শবতুল্য, এবং (নামে) ঈশ্বর হইয়াও অনীশ্বর
 (সর্ব্ব কর্ম্মাক্ষম) এইরূপে যেন বাচ্য (নিন্দনীয়) বলিয়াই
 গণ্য হন।

দুর্গেতি দুর্গতিহরা শরদি প্রপূজ্য,
 ধাত্রাতি বিশ্ব জগতশ্চ ততোহর্চনায়া।
 ধ্বজা বসন্তভিলকং পুনরেষি চ ত্বং
 চৈত্রে বিচিত্র বিভবা বরদা বরেন্যা ॥৩॥

সংখ্যা (অ হইতে দ্ব পঞ্চাশ পঞ্চাশটি বর্ণমালা) পূর্ণ করে। শব্দ হইতেই
 বিশ্বের সৃষ্টি বুঝিতে হইবে।

উপরের শ্লোকে ভগবানকেই অমৃতরা শক্তি এবং ইচ্ছা ও উন্মেষকে
 তাঁহার ঐশ্বর্য্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে
 হইবে—মা-ই আত্মা এবং স্বাধীনা এবং সৃষ্টির ব্যবস্থাপিকা। শিব সত্তা মাত্র
 দ্বারা তাঁহার নিষ্ক্রিয় সহযোগী। মায়ের “উমা” নামেরও ঐ সার্থকতা—
 উ উন্মেষ মিমীতে (মা ধাতু)।

†এই শ্লোকেটি বসন্তভিলক নামক সংস্কৃত ছন্দেই রচিত। ইহা মাকে
 সন্নিহিত করুক এই প্রার্থনা।

দুর্গতিহারিণী তুমি দুর্গারূপে শরৎকালে বিশেষ ভাবে পূজ্যা ।
তৎপর বিশ্ব জগতের ধাত্রী (মাতা) অর্থাৎ জগদ্ধাত্রীরূপে
অর্চনীয়। পুনশ্চ বরদা বরণ্যা বিচিত্র বিভবা তুমি চৈত্রমাসে
বসন্ততিলক ধারণ করিয়া অর্থাৎ বাসন্তীরূপে (পূজা গ্রহণার্থ)
আগমন কর ।

কালী করালবদনা প্রলয়াধিনেত্রী
মিথ্যা জগৎ প্রকটিতং কুরুষে সুভদ্রা ।
জ্ঞানং দদাসি চ তথা পরমং গুণিভ্যো
হস্তদ্বয়েন বিতন্নশুভয়ং বরঞ্চ । ৪॥

করালবদনা কালীরূপা তুমি প্রলয়ের (জগৎ-সংহারেরই)
অধিনেত্রী ; অথচ সুমঙ্গলা । কেননা ঐ প্রকারে (প্রলয়ের
অভিনয় করিয়া) তুমি জগৎ যে মিথ্যা ইহা প্রকটিত কর এবং
গুণীদিগকে পরম জ্ঞানও দান কর । অপিচ (অশ্রু সকলকে)
তোমার (চারি হস্তের মধ্যে) দুই হস্ত দ্বারা অভয় ও বর দান
কর ।

ক্ষুৎকাতরশ্চ জগতঃ কুপয়া কৃতে হম্
অন্নং প্রযচ্ছাসি যথা শশিমৌলি-পাণ্যোঃ ।
তদ্বল্লভ কৰ্ম্মবিধানা বিশ্বতাহাস্ত সৃষ্টি-
স্তল্লালয়া চ মহিভা সূচিরায় কাশী । ৫॥

ক্ষুধায় কাতর জগদ্বাসীদিগের জন্য কৃপাপূর্বক তুমি
(অন্নপূর্ণারূপে) যে ভাবে শশিশেখর শিবের যুগল হস্তে অন্ন
প্রদান কর, সেই মনোরম কৰ্ম্মবিধি দ্বারা সৃষ্ট জগৎ বিশ্বত

রহিয়াছে। আর সেই লীলা দ্বারা (সেই লীলাস্থল বলিয়া)
কাশী সূচিরকাল বন্দিতা আছে।

তত্রৈব মুণ্ডনবকেন সুরক্ষিতং বদ্
যোগীন্দ্রবর্য্য-বরগীর-বিভূতিপিণ্ডম্।
সিদ্ধাসনং প্রকটশক্তি সূদৌণ্ডতেজো
গৃহ্যসি শুভ্র সফলাম্ অচিরাৎ সগর্য্যাম্ ॥৬॥

সেই কাশীতেই শ্রেষ্ঠ যোগীদিগেরও মাত্র ব্যক্তি বিশেষের
(জীজীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের) যে বরেণ্য পিণ্ডীকৃত
বিভূতিরানি নয়টি মুণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত এবং সুব্যক্ত শক্তিদ্বারা
প্রদীপ্ত তেজো বিশিষ্ট সিদ্ধাসনরূপে (নবমুণ্ডী নামে) পরিচিত,
তথায় তুমি যে পূজা গ্রহণ কর তাহা অচিরেই সফল হয়।

লক্কো ময়া গুরুবরাৎ প্রথিতানুভাবান্
মন্ত্রস্তুদীয়করুণাপ্রসবস্বদর্থঃ।
দোষৈর্নিরুদ্ধফলকঃ স হি বদ্ বিভাতি
তস্মান্নয়াহতিবিকলেন কৃপাহর্থ্যতে তে ॥৭॥

আমি সুবিখ্যাত ষোড়শৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট সদগুরু হইতে তাঁহারই
করুণাপ্রসূত এবং তোমার পরিতোষার্থ বিহিত মন্ত্র লাভ
করিয়াছি। কিন্তু যেহেতু তাহার ফলোদয় (আমার) বহু দোষ
দ্বারা নিরুদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মনে করি, সেইজন্য আমি অতি
বিস্মল হইয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

অলৌকিক দর্শন

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা

গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে আমি শ্রীশ্রীবিজ্ঞানন্দ পরমহংসদেবের নিকট দীক্ষালাভ করি। তৎপরে আমি বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের দ্বারা সবডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হই। আমি ১৫ই অগষ্ট, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ অবধি চুঁচুড়া সহরে ছিলাম। তখন আমার গুরুদেব একদিনের জন্য আমাদের চুঁচুড়ার বাসায় গিয়াছিলেন—ইহা মনে হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে আমার মনে খুব প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় যে ব্রহ্মলোক দর্শন করিতে হইবে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঐ ইচ্ছা খুব প্রবল হয়। তাহার পূর্বে আমি উপনিষদ পড়ি নাই। একদিন সন্ধ্যা বেলায় আমি আমার ঘরে গুরুদত্ত যোগের ক্রিয়া করিতেছিলাম। ৩৪ মিনিট ক্রিয়া করার পরে দেখি যে আমার ডান দিকের জানালা দিয়া একটি ছায়ামূর্তি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার নিকট হইতে প্রায় ৬ হাত দূরে দাঁড়াইলেন। আমার ঘরটা প্রায় ১৫ ফুট লম্বা ছিল, বাহির হইবার একমাত্র দরজা বন্ধ করা ছিল। বাহাতে বাহির হইতে কেহ খুলিয়া প্রবেশ করিতে না পারে। আমার ডান দিকের দেওয়ালে চারিটি ৬ ফুট লম্বা লোহার রড

দেওয়া জানালা ছিল। সেই জানালা দিয়া কোন স্থলদেহধারী মানবের প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

আমি ৩৪ মিনিট ক্রিয়া করিবার পর আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া যায় এবং ঐ মুদ্রিত অবস্থায় দেখি যে আমি যেন গিয়া ঐ মূর্তির পদতলে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে দুই হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, “আমার মধ্যে যিনি আছেন তিনি তোমার মধ্যেও আছেন। অতএব আমাকে প্রণাম করিবার কোন প্রয়োজন নাই।”

ঐ মহাত্মার চেহারা ১৬ বৎসর বয়স্ক কিশোরের স্থায় ছিল— দাড়ী গোঁফ নাই, মস্তক মুণ্ডিত, বাম হাতে করস্ক, পরিধানে ফিকে গেরুয়া রংয়ের আলখাল্লা, খুব ফরসা, অতীব কমনীয় মূর্তি। খুব তাড়াতাড়ি কথা বলিলেন। সর্বদা হইতে আনন্দ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। কথাগুলি অতীব মধুর। তিনি বলিলেন, “আমার সঙ্গে চল।” আমি বলিলাম, “সৃষ্টিশরীরে ঘাইবার ত আমার ক্ষমতা নাই।” তিনি বলিলেন, “আমার হাত ধর।” করস্ক ডান হাতে লইয়া তিনি তাঁহার বাম হাত দিয়া আমার ডান হাত ধরিয়া বলিলেন, “চল ঘাই।” বলা মাত্রই আমার ঘর হইতে দুইজনেই বাহির হইলাম। কিছু দূর গিয়া তিনি বলিলেন, “ঐ দেখ, তোমাদের পৃথিবী কি রকম ভাবে ঘুরিতেছে।” পৃথিবী কি ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে তাহা দেখিতে পাইলাম। তৎপরে তিনি বলিলেন, “ঐ দেখ, তোমাদের সৌর জগতের মঙ্গলগ্রহ কেমন ঘুরিতেছে।”

রক্তবর্ণ মঙ্গল গ্রহের গতি ও রূপ দূর হইতে দর্শন করাইলেন । আমি বলিলাম, “কোন্ পথে যাইবেন ?” তিনি বলিলেন, “তোমাদের সূর্য্যের নিকট দিয়া যাইব না । অন্য পথে যাইব, চল । বহুদূর যাইতে হইবে ।” তৎপরেই ভীষণ বেগে লইয়া চলিলেন । কতদূর গেলাম তাহা বলা অসম্ভব । আমাদের গতির বেগ পৃথিবীর কোন বেগের সহিত তুলনীয় নহে । কিছুক্ষণ পরে মহাত্মা বলিলেন, “এইবার স্থির হও ।” যেস্থানে অপেক্ষা করিলাম সেখানে আলো নাই, অন্ধকার নাই, কোন শব্দ নাই—Perfect Stillness বিরাজ করিতেছে । সেখানে কোন রকম আলোড়ন নাই । সেখানে আমার দেহ হইতে যেন একটা খোলস ছাড়িয়া পড়িল এবং আমার (সূক্ষ্ম) শরীর আরও খুব হালকা হইয়া গেল । তিনি বলিলেন, “চল, যতদূর আসিয়াছি তাহা হইতে আরও বহুদূরে ও অতীব বেগে যাইতে হইবে ।” তাহার পর আবার রওনা হইলাম । ভীষণ বেগে তিনি আমাকে লইয়া চলিলেন । কতদূর ও কত বেগে গিয়াছিলাম তাহা বলা অসম্ভব । এক স্থানে গিয়া তিনি বলিলেন, “এইবার শোন ।” মন স্থির করিবামাত্র গম্ভীর প্রণবধ্বনি শুনিতে পাইলাম । ঐ ওঁকারধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া হইতেছে । অ, উ ও ম এই তিনটি ধ্বনি উর্দ্ধে উঠিতেছে । ঐ তিন ধ্বনি উপরে উঠিয়া একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, আর ঐ কেন্দ্র বা বিন্দু হইতে বিশুদ্ধ শুভ্র জ্যোতির ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে । ঐ বিন্দু ঘিরিয়া একটি বৃত্তের সীমার মধ্যে প্রকাশিত হইল একটি perfectly white region—সেখানে কোন রং

নাই। যেক্ষোতির ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে তাহা যেন (liquified) তরল জ্যোতি। কোটি সূর্যের আভা অপেক্ষা ঐ কেন্দ্রের জ্যোতি অধিক উজ্জ্বল, কিন্তু উহা কোটি চন্দ্রের আভা অপেক্ষাও অধিক শীতল। দাহ ভাবটা মোটেই নাই। ঐ জ্যোতি ধারার নীচের দিকে ঐ ধারাতে বেগুণী, নীল এবং সর্বশেষে লাল আভা দেখিতে পাইলাম। আমি ঐ ধ্বনি শুনিয়া ও ঐ বিন্দু ও জ্যোতিসমুদ্র দেখিয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। তখন ঐ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ঐ বিন্দু ও ঐ শব্দ কি? আমি ঐ বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাই। আমায় ছাড়িয়া দিন।” মহাত্মা বলিলেন, “ঐ শব্দই শব্দব্রহ্ম। ঐ বিন্দুই ব্রহ্মবিন্দু। উহাকে বেষ্টন করিয়া যে সাদা অংশ দেখিতেছ সেখানে তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সম্পূর্ণরূপে সাম্যাবস্থায় আছে। সেখানে সৃষ্টি নাই। ঐখান হইতে যে শুভ্র জ্যোতির ধারা নীচের দিকে যাইতেছে তাহার নিম্ন অংশে যে রংয়ের খেলা দেখিতেছ সেখান হইতে সৃষ্টির বীজ ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এখন যদি তোমাকে ছাড়িয়া দিই তাহা হইলে তুমি বা তোমার সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মা ব্রহ্মবিন্দু মধ্যে প্রবেশ করিবে। কিন্তু উহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার পন্থা বা উপায় জান না বলিয়া তোমার সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মার সহিত যে যোগসূত্র আছে তাহা ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তোমার স্থূল শরীরের মৃত্যু হইবে। পৃথিবীতে ডাক্তার তোমার শরীরের মৃত্যু হইয়াছে বলিবে।” আমি বলিলাম, “তাহা হইলে উপায় কি?” তিনি বলিলেন, “আজ এই অবধি থাক। আমি বলিতেছি

আমি আবার আসিব। তোমাকে লইয়া ঐ ব্রহ্মবিন্দুর ভিতরে গিয়া সমস্ত দেখাইব এবং বাহির হইয়া আসিবার উপায় বা পন্থা শিখাইয়া দিব। সমস্তান্তরে নিশ্চয়ই আসিব জানিবে। এখন ফিরিয়া যাই, চল।” তৎপরে আমি দেখি যে আমি ও তিনি চুঁচুড়ার ঘরে দাঁড়াইয়া আছি। আমি নত হইয়া প্রণাম করিতে গেলে তিনি আবার বলিলেন, “আমার মধ্যে যিনি আছেন, তোমার মধ্যেও তিনিই আছেন, অতএব প্রণামের প্রয়োজন নাই। বারান্তরে নিশ্চয়ই আসিব ও লইয়া যাইব।”

আমার ধ্যান ভঙ্গের পর আমি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচের তলায় যাইবা মাত্রই আমার ভাগিনেস্বী সুহাসিনী ঘোষ বলিল, “ছোট মামা, তুমি আজ দেড় ঘণ্টা আফ্রিক করিয়াছ। তোমার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। তোমার কপাল ও শরীর হইতে অপরূপ গন্ধ বাহির হইতেছে। ইহা ত কোন ৪৪৪৪৫৫৫ এর গন্ধ নহে।” সুহাসিনী, আমার মা ও আমাদের হিন্দুস্থানী পাঠক আমার কপালে হাত ঘসায় তাহাদের হাতে অপূর্ব গন্ধ হইয়া গেল। তখন আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঐ অপরূপ গন্ধ বাহির হইতে লাগিল এবং আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম। ঐ আনন্দ ৭ দিন ধরিয়া উপভোগ করিয়াছি। উহা বর্ণনাভীত, কোন পার্থিব দ্রব্য প্রাপ্তিতে ঐরূপ স্বর্গীয় আনন্দ হইতে পারে না। ইহা অপরূপ এবং ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

বিন্দুদর্শনের রহস্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

আমার শ্রদ্ধাম্পদ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ‘অলৌকিক দর্শন’ নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বিষ্ণুদ্ববাণীর এই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। এই অলৌকিক দর্শন ব্যাপারের রহস্যটী কি তাহা আমি তাঁহারই অনুরোধে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। অলৌকিক দর্শন নানা প্রকার হইতে পারে। কিন্তু সকল দর্শনই তত্ত্ব-দর্শন নহে। মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংস্কার পুঞ্জের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে অনেকে অনেক প্রকার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সে সব দর্শন অজ্ঞাতভাবে হইলেও স্থূল কল্পনা হইতে প্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘোষ মহাশয় যে দর্শনের বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই জাতীয় কল্পিত দর্শন নহে। যে মহাপুরুষের অনুগ্রহে তিনি স্থূল জগত হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখে পর পর বিভিন্ন আবরণ ভেদ করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন তিনি শুধু যে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন তাহা মনে হয় না। তিনি ব্রহ্মবিৎ, তত্ত্বদর্শী, বিশ্বাতীত সত্তাসম্পন্ন অতি উচ্চকোটির মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি যিনিই হউন সমগ্র প্রাকৃত জগতের নমস্ তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন তিনি ফণীন্দ্র দাদাকে হাতে ধরিয়া উর্দ্ধলোকে যাত্রা করিলেন তখন

ফণীন্দ্র দাদার ভৌতিক স্থলদেহ ষষ্ঠাস্থানে পড়িয়া থাকিলেও তাঁহার সূক্ষ্মদেহকে নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিয়া চলিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি স্থলদেহেই ছিলেন অথবা সূক্ষ্মদেহে? ইহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে তিনি ঠিক স্থলদেহীও ছিলেন না, এমন কি সূক্ষ্মদেহীও ছিলেন না। স্থল যে ছিলেন না তাহা সহজেই বুঝা যায়। যদিও তিনি স্থলভাবে ফণীদাদার স্থলদেহ স্পর্শ করিয়াছিলেন একথা সত্য, তথাপি তাঁহার দেহ স্থল নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তিনি আকাশ মণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবীর কক্ষা মঙ্গল গ্রহের কক্ষা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অন্তর্যাক্ষে উর্দ্ধ গমনে সমর্থ হইতেন না। তারপর তিনি যে স্থল বিরহিত সূক্ষ্মশরীর সম্পন্ন ছিলেন তাহাও বলা যায় না। কারণ ঐরূপ অবস্থায় স্থলদেহকে স্পর্শ করা ও ঐ দেহীকে স্পর্শের অনুভব করান অসম্ভব। তিনি উত্থিত হইয়া যে স্থান হইতে অগ্রবর্তী মার্গে গমন করার পূর্বে ফণীদাদাকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিয়াছিলেন সেই স্থানটী অশুদ্ধ ও শুদ্ধ জগতের সন্ধিস্থল, এবং এইজন্যই ঐস্থানে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফণীদাদা একটি অপরূপ অদ্ভুত অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার মনে হইয়াছিল ঐস্থানে আকর্ষণ নাই, বিকর্ষণ নাই, শৈত্যবোধ নাই, তাপবোধও নাই, আলোক নাই, অন্ধকারও নাই, একটি অপরূপ স্নিগ্ধ প্রকাশ মাত্র বিরাজ করিয়া থাকে। ঐখান হইতেই তাঁহার অতি দ্রুত বেগে উর্দ্ধে উত্থিত হন। পূর্বের বেগও দ্রুতই ছিল বটে, কিন্তু এই সময়কার বেগের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। যে বেগে পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি নিজ নিজ কক্ষায় আবর্তন করে

তাহার তুলনায় আলোক রশ্মির বেগ যেমন অতি মাত্র অধিক, এই স্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে । আলোকের বেগ জাগতিক সকল প্রকার বেগ হইতে অধিক, কিন্তু মনের বেগ আলোক হইতেও অধিক এবং মনও যত অধিক শুদ্ধ হয় তাহার বেগও তত অধিক । আলোকের বেগ হইতে অধিক বেগ আমরা কল্পনা করিতে পারি না । কিন্তু ক্ষিপ্ত মনের বেগের সহিত তুলনা করিলে আলোকের বেগকেও মন্দ বেগ বলিয়াই বর্ণনা করিতে হয় । মনের বেগ তীব্র হইলেও বিশুদ্ধ মনের বেগ আরও তীব্র । শুদ্ধতার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বেগের তীব্রতা বাড়িয়া থাকে ।

ঐস্থান হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইলে এমন একটি শান্ত স্থানের প্রকাশ হইল যেখান হইতে মহাপুরুষ তাঁহার সাথীকে বহু উর্দ্ধে বিন্দু দর্শন করাইতে সমর্থ হইলেন ।

যোগীদের জানা আছে যে এই বিপুল সৃষ্টির মধ্যে যে কোন স্থান হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে হইলে সর্বপ্রথম বিরুদ্ধ শক্তির ক্ষেত্র অনুভব করিতে হয় । এই ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী শক্তিপুঞ্জ ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা বিরোধ হইতে মুক্ত হইয়া সাম্য অবস্থা লাভ করে ও উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয় । তীব্রগতির অবসানে উর্দ্ধগতির প্রাপ্ত ভাগে স্থিত হইয়া বিন্দুদর্শন প্রাপ্ত হয় । এই বিন্দুই ব্রহ্মবিন্দু । ইহা মনুষ্যের তৃতীয় নেত্র অথবা গুপ্ত চক্ষুরূপে যোগীদের নিকট পরিচিত । এই ব্রহ্মবিন্দুই ভেদ করা আবশ্যক এবং তাহা করিতে না পারিলে পরিপূর্ণ ব্রহ্মসত্তায় উপনীত হওয়া

যায় না। এই বিন্দুটি যে অতি শুভ্র ইহা অত্যন্ত সত্য। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এইরূপ শুভ্রতা আর কোথায়ও দেখা যায় না। এই বিন্দুটি একটি শুভ্র স্বেতবর্ণ মণ্ডলের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহা একটি অতি সূক্ষ্ম ছিঁড়ের অনুরূপ। ইহাকে বিন্দু করাই যোগীর লক্ষ্য-ভেদ। বস্তুতঃ ইহা শব্দব্রহ্ম স্বরূপ। নিম্নে বিরাট সৃষ্টি প্রপঞ্চ হইতে যে তিনটি ধারা অকার, উকার, মকার রূপে নিরন্তর উদ্ভিত হইতেছে তাহাদের সবগুলি ঐ বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। বিন্দুতে ঐ সকল উর্দ্ধ ধারার আঘাতের ফলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া অসীম অনন্ত জ্যোতিপুঞ্জরূপে চারিদিকে নিঃসৃত হইতেছে। চারিদিকে নিরন্তর অনন্ত শূন্য মণ্ডল স্তম্ভিত করিয়া ঘোর গর্জ্জন নিঃসৃত হইতেছে। ইহাই সৃষ্টি-উন্মুখ প্রণবের গর্জ্জন।

যে সকল জ্যোতি ঐ বিন্দু হইতে নিঃসৃত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে সবগুলিই রঞ্জনাত্মক অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের সমষ্টি রূপ। এই সকল বর্ণের যোগাযোগে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বা হইয়া থাকে। এই সকল বর্ণই সৃষ্টির উপাদান—“অজ্ঞামেকাং লোহিত গুরু কৃষ্ণাম্।” সৃষ্টির উর্দ্ধে বর্ণ নাই। কেবল মাত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বের শুভ্রতা। এই বিন্দুর মধ্যপথে প্রকৃত মধ্য মার্গ নিহিত রহিয়াছে। নাদ হইতে নাদান্ত পর্য্যন্ত তাহার বিস্তার। এই মার্গে নাদান্ত ভেদ করিয়া শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মহাশূন্য অতিক্রম করিতে পারিলে সমনাশক্তির দ্বারদেশে উপনীত হইতে পারা যায়। তখন সমস্ত আবরণ হইতে

মুক্তিলাভ ঘটে। তাহার পর বিগ্ধ আত্মা উন্মনী নামক পরম-
শিবের শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাহার পর উহাও অতিক্রান্ত হয়।
তখনই পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার পূর্ব নহে।

বিন্দু হইতে নাদের দিকে ঘাইতে হইলে অর্দ্ধচন্দ্র পার হইয়া
নিরোধিকার ঘাট অতিক্রম করিতে হয়। মহাশক্তির সাক্ষাৎ
অনুগ্রহ না থাকিলে নিরোধিকা ভেদ করিতে পারা যায় না—
এপার হইতে ওপারে যাওয়া যায় না, ওপার হইতেও এপারে কেহ
আসিতে পারে না। ইহাই লক্ষ্য করিয়া ঐ মহাপুরুষ দাদাকে
বলিয়াছিলেন যে এখনও তাঁহার পক্ষে বিন্দু ভেদ করা সম্ভব নয়।
আধারের ঘোগ্যতা বৃদ্ধি হইলে তিনি নিজেই আসিয়া তাঁহাকে
লইয়া ঘাইবেন। ঐ মহাপুরুষ যে কল্পিত নহেন তাহার প্রমাণ
এই যে তিনি বহুবার দাদাকে দর্শন দিয়া বিভিন্ন প্রকার বিপত্তি
হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরু স্মরণে

শ্রীরাজবালা দেবী

‘জীবন ধন্য, জনম ধন্য, মরণ ধন্য হইবে ;

কাতর কণ্ঠে ডাকোগো তাঁহারে—

বাহিয়া তরণী যাইবে ॥’

আমি কাশীতে ১৯৪ নং গণেশ মহল্লায় বাস করি। আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমে (মালদহিয়া) সময় সময় সুযোগ সুবিধা মত আসা-যাওয়া করিতাম, প্রতি উৎসবেই যোগদান করিতাম এবং মাঝে মাঝে আমার এক গুরুভ্রাতা শ্রীমোহিনীমোহন সাহায্য মহাশয়ের স্ত্রীর (গুরুভগিনী) সঙ্গে নবমুণ্ডীর প্রাজ্ঞণের আসনে বসিতাম। আমি পূর্বে কখনও আশ্রমে বসবাস করি নাই। এই নবমুণ্ডীতে আসনে বসার পর হইতেই আশ্রমের প্রতি একটা আকর্ষণ ও নবমুণ্ডী মায়ের কৃপা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। ইহার পর আশ্রমের প্রতি আমার এত আকর্ষণ হইল যে আমি শেষ পর্যন্ত আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলাম।

এই আশ্রমে আসার পর হইতেই শ্রীগুরুদেবের অসীম কৃপায় নানা রকম উপলব্ধি হইতে লাগিল। আশ্রমে পৃথক মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের একটি মর্ম্মর মূর্তি আছে। শিব

মন্দিরে একত্রিশটি বাণলিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত আছে, অষ্টধাতু নির্মিত শ্রীশ্রীভগ্নী মায়ের মূর্তি আছে ও শ্রীশ্রীগোপাল ঠাকুরের একটি মূর্তি আছে। নবমুণ্ডী মায়ের আলাদা মন্দির ও আসন আছে, আসনের পাশে ঘট ও তাহার মাথায় একটি নারিকেল দেওয়া আছে।

আমি প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সব মন্দিরে দর্শন ও পূজা করি এবং নবমুণ্ডী মায়ের প্রাক্ষণে নিয়মিত আসনে বসি। নবমুণ্ডী মায়ের প্রাক্ষণের আসনে পর্দা দেওয়া আছে যাহাতে বাহির হইতে ভেতরে এবং ভেতর হইতে বাহিরে দেখা না যায়। আমি ১৩৭০ সালের আশ্বিন মাসে একদিন রাত্রি তিনটার সময় আসনে বসিয়া জপ করিতেছিলাম। ঐ দিন ভোরের সময় ঐখানে বলি হইয়াছিল। নবমুণ্ডীতে বলি দেওয়ার প্রথা আছে। বলির সময় আমি আসনে উপবিষ্ট ছিলাম, পর্দা থাকার দরুণ আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই। কিন্তু বলির সময় পাঠার ডাকের শব্দটা হঠাৎ আমার কানে গেল। তখন আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল এবং চোখে জল আসিল। আমি মনে মনে বলিলাম—‘মা, তোমার সম্মুখে বলি হ’লো, তুমি ওকে দেখো।’ ইহার পর আমার কাজ শেষ হইলে আমি আসন হইতে উঠিয়া আসিলাম। বৈকালে মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি—যেখানে ঘটের উপর ডাব ছিল সেইখানে বলি দেওয়া পাঠার মুণ্ডটি কাৎ হ’য়ে আছে, যেন খুব ক্লান্ত হইয়া খুব আরামে ঘুমাইতেছে। এই দৃশ্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলাম। পরে

আশ্রমের সনৎ ব্রহ্মচারী (আমার গুরুভাই) দাদাকে এই ঘটনাটি বলিলাম এবং এই দৃশ্য দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। বলিলাম—‘এইমাত্র আমি দেখিয়া আসিলাম। আপনি এখনি গেলে দেখিতে পাইবেন।’ তিনি বলিলেন ‘আপনি দেখিয়াছেন বলিয়া আমি কি দেখিতে পাইব?’

এই আশ্বিন মাসেরই আর একটি ঘটনা। একদিন দেখি—আশ্রমের সদর গেট হইতে ৩৬৬ গা মায়ের মন্দির পর্য্যন্ত ভীষণ জ্যোতি, অতি ঘনীভূত জ্যোতি। জ্যোতি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, রাস্তা, পথ আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই দৃশ্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে চমক ভাজিয়া গেলে পথ ঘাট সব দেখিতে পাইলাম।

এই মাসেই আর একদিন দুর্গা মায়ের সম্মুখে বসিয়া দর্শন করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি—মায়ের চালচিত্রখানা নিয়া মা টলমল করিতেছেন। কি তার ঝাঁকুনী, চারিদিকে জ্যোতি ঝলমল করিতেছে। কিছুক্ষণ এইরূপ করার পর দেখি যে মা যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছেন, কিন্তু কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই সময় পূজারীরা পূজার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করায় মন চঞ্চল হইয়া গেল এবং দৃশ্যটি থামিয়া গেল।

১৪ই কার্তিক কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন অনুমান সকাল দশটা হইবে। নবমুণ্ডী মাকে দর্শন করিতে যাই। মার মন্দির

তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দর্শন করিতেছি (লোহার দরজা-বাহির হইতে দর্শন করা যায়)—মাঝে মাঝে ঘটে দর্শন পাই বলিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছিলাম। এমন সময় দেখিলাম যে মন্দিরের ভেতর জ্যোতিতে ভরিয়া গেল। যে পাথরের উপর ঘটটি রাখা আছে সেই পাথর সমেত ঘটটি ওলট পালট হইয়া ছলিতে লাগিল। তাহার পর উহার ভিতর হইতে দশ মহাবিচারূপা মাতার পর পর একের পর এক রূপ বাহির হইতে লাগিল। সকলেই বেশভূষা করা—মাথায় মুকুট পরা, সুন্দর সুন্দর গহনা ও কাপড় পরা—আর কি যে সুন্দর ফুলের গহনা পরা তাহা বলা যায় না। অনেক রকম ফুল—গেঁদা ও শিউলি ফুল ছাড়া আর কোন ফুল চিনিতে পারিলাম না। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ঐ স্থানটি একটি বিরাট সমুদ্রে পরিণত হইয়া গেল। তাহাতে ঢেউ ও ফেনাসহ তরঙ্গ খেলিতে লাগিল—কি সুন্দর সে রূপ। তাহাতে মায়ের মূর্তিগুলি জলের উপর খেলা করিতে লাগিল এবং মায়ের অঙ্গের জ্যোতি জলে ও ফুলের উপর পড়িতে লাগিল। পরে গাঢ় জ্যোতিতে সব ঢাকা পড়িয়া গেল। এই দৃশ্যের পর আমার মাথা বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং ঐ স্থানেই বসিয়া পড়িলাম।

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৭০ সালের আর একটি ঘটনা। দুর্গা মার মন্দিরে একত্রিশটি শিব স্থাপিত আছেন। যেটি বড় শিব তাঁহার নাম অখিলেশ্বর শিব (ইহা শ্রীগুরুদেবের পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত)। মাঝে মাঝে কিছু কিছু দর্শন পাই বলিয়া রোজ্জই

মন্দিরে গিয়া বসি। এই দিন গিয়া দেখিলাম যেন পাথরের শিবটি বেশ নড়াচড়া করিতেছে। মূর্তিটি জ্যোতির্ময়। পরে দেখি মাথায় একটি পর্দার মত আস্তে আস্তে হৃদিক হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল। পর্দাটি দেখিতে যেন বোনা বোনা সাপের খোলসের মত। এইভাবে দর্শন রোজই চলে। ক্রমে ক্রমে এই শিবটির বড় আকার রূপে দর্শন পাই। একদিন দেখি শিবের দুই হাত উচু করা। আর যে ত্রিশটি শিব আছে—সেখানে সবই জ্যোতির্ময় দেখি।

ইহার পাশেই গোপালের মূর্তি আছে। 'নিয়মিত রোজই গোপালের নিকট বসি—সেখানেও কিছু দর্শন পাই। ইহা ২৬শে অগ্রহায়ণের কথা—আজ বৈকাল পাঁচটার সময় দেখছি যে গোপাল হঠাৎ হাঁ করিল। দেখিলাম হাঁটা ধীরে ধীরে বেশ বড় হতে লাগিল। সামনে উপরের পাটিতে দুটি দাঁত এবং নীচের পাটিতে দুটি দাঁত। ঐ হাঁয়ের মধ্যে তিনটি ছোট ছোট মূর্তি দেখিলাম এবং পরে হাঁয়ের ভিতর হইতে বিরাট ঘনীভূত জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। ইহার পর সেই জ্যোতিতে গোপালও ঢাকিয়া গেল।

গোপালের মূর্তির পাশে গোপালের তুখানি চরণ বাঁধানো কাচের আলমারীর মধ্যে রাখা আছে। এই চরণ তুখানির ইতিহাস আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব পুরীতে যখন ছিলেন তখন একদিন গোপাল আসিয়া বিছানার চাদরের উপরে খেলা

করিয়াছিলেন। ঐ চাদরের উপরে গোপালের দুখানি চরণের ছাপ পড়ে।* ঐছাপটি গোপালের মূর্তির পাশেই রাখা আছে।

আমি প্রত্যাহই নিয়মিত এই চরণ দুখানি দর্শন করি, কিন্তু দর্শন করিতে গেলে চরণের স্থানে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেখিতে পাই। এদিকের চরণেও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আর ওদিকের চরণেও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেখি। আর চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব নীচু হইয়া দেখিলে তবে চরণ দর্শন পাই।

এই তারিখেই গুরুদেবের মন্মথ মূর্তি দর্শন করিতে গিয়া দেখি বাবার কপালের মাঝখানে লাইন করা বড় বড় অক্ষরে লেখা, যেমন খবরের কাগজে বড় বড় হরফে হেডিং থাকে। লেখাটি কালো রংয়ের অক্ষরে লেখা স্পষ্ট, কিন্তু কি লেখা সেটা ধরা গেল না। ইহার পর দেখি বাবার কপালে ফোঁটা ফোঁটা সাদা চন্দনের ফোঁটা সাজান গাল পর্য্যন্ত। আবার দেখি বাবার চোখ দুটি একবার তাকান, আবার বন্ধ করা। মুখও নাড়ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ও নাড়ছেন। আবার দেখি বাবা হাসছেন—মুখটি হাঁ করা, কিন্তু দাঁত নেই।

বিজ্ঞান মন্দিরের নীচের ঘরে গুরুদেবের একটি তৈলচিত্র

* শ্রীশ্রীগুরুদেব ঐ দিন “দেহি পদ পন্নবমুদারম্” বলিয়া কিছুক্ষণ ভাবনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কিছুক্ষণ পরে বিছানার ওপর চাদরের উপর ছোট ছোট দুখানা জ্যোতিষ্ময় চরণের আবির্ভাব হয়। দীর্ঘকাল ঐ চরণ-চিহ্ন বর্তমান ছিল। পরে উহাকে চিহ্নিত করিয়া সংরক্ষণ করা হয়।

—সম্পাদক।

আছে। সেখানেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু দর্শন পাই এবং প্রতিদিনই দুইবেলা প্রণাম করিতে যাই। একদিন শ্রীচরণে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি যে চরণের গোড়ালির উপরে—গুজরী, পঞ্চম ও ঘুঘুর পড়ানো চন্দনের ফোঁটা ফোঁটা সাজান। তাহার নীচের পাতায় চরণ পদ্ম ফোঁটা ফোঁটা চন্দন দিয়ে আঁকা। আর কপালে দেখি দু'সারি চন্দনের ফোঁটা পড়ানো গাল পর্য্যন্ত—বিচিত্র রকম। তার ভিতর লাল রংয়ের সব অক্ষর লেখা। কিছুক্ষণ এই সব দেখার পর জ্যোতিতে মূর্তিটি ঢাকিয়া গেল।

এই সময় একদিন আসনে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় কোন স্থানে যেন যাইতেছিলাম। শেষে পথ হারাইয়া অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। অকস্মাৎ একটি রাস্তার চৌমাথায় দেখি গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমায় ডাকিয়া বলিলেন—‘ওদিকে নয়—এই দিকে—এই দিকেই আমি থাকি।’ এই বলিয়া তিনি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন তার বাঁদিকের রাস্তা আমায় দেখাইয়া দিলেন।

প্রায় তিন বৎসর পূর্বের একটি ঘটনা—তখন আমার গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অপারেশনের জন্য বোম্বাই গিয়াছেন। এই সময় একদিন আমি আসনে বসে আছি। দেখছি যে আমি এক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এমন সময় শ্রীশ্রীগুরুদেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে চল্লেন। অনেকক্ষণ চলার পর আমরা একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ

করলাম। সেখানে দেখি আমার গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একটি চোকির উপর শুইয়া আছেন। আর চারিদিকে ছোট ছোট কুমারীরা তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া আছেন। দাদা বাবাকে দেখিয়া খুব কাতর ভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। বাবা তখন বলিলেন—‘ভয় কি? তোমার তো মা আছেন।’

এখানে আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত ঘটনাগুলি বাহা বর্ণনা করা হইল তাহা অতি অল্প কথায় কেবল কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র। নিম্প্রয়োজন বোধে বহু কথা পরিত্যাগ করা হইল।

হে গুরুদেব, আপনি আমার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার আশ্রমের যে ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা হইল ইহা আপনারই ইচ্ছিতে। এই ঘটনাগুলি আপনারই শ্রীচরণে প্রদান করি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং আমাকে রক্ষা করুন। আমি বারংবার আপনার শ্রীচরণে প্রণাম জানাইতেছি ॥

সিদ্ধভূমি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

যাঁহারা ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার সহিত পরিচিত
আছেন তাঁহারা জানেন যে অন্তে সাধনার লক্ষ্য পূর্ণতা লাভ
হইলেও আপাততঃ বিভিন্ন প্রকার বলিয়া মনে হয়। তদনুসারে
কেহ জ্ঞান অথবা ধোণের পথে অগ্রসর হইয়া জীবন্মুক্তি লাভকেই
সাধনার লক্ষ্য মনে করেন। জীবন্মুক্তির পর দেহান্তে পরামুক্তি
চরম লক্ষ্য। এই পরামুক্তিও নানা প্রকারে নানা সাধকের
দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। কেহ কেহ মনে করেন সাধনার পর
সিদ্ধাবস্থার লাভই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। এইজন্ত সাধনায়
পূর্ণতা প্রাপ্ত সিদ্ধ মহাপুরুষের উপর আমাদের দেশের আবাল-
বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই স্বাভাবিক শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়।
প্রাচীন কালে চৌরাশি জন সিদ্ধপুরুষের নাম ও বিবরণ প্রাপ্ত
হওয়া যায়। ইহা একটি বিশেষ সময়ের কথা। ইহা ছাড়াও
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধপুরুষের উদয়
হইয়াছে, ইহাও জানিতে পারা যায়। ইহারা অতিশয়
শক্তিশালী মহাপুরুষ। জড় জগৎ ও চিন্ময় ভূমির অন্তরালে
উভয়ের সেতু বা সংযোজক রূপে ইহারা বিद्यমান আছেন।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি সিদ্ধপুরুষের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া

সিদ্ধভূমির কথাই সংক্ষেপে কিছু কিছু বর্ণনা করিব। 'সিদ্ধভূমি' কথাটি অনেকের নিকটে বোধ হয় অপরিচিত বোধ হইবে। কারণ অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন—মানুষ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভূমি কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করার পূর্বে জানা আবশ্যক 'সিদ্ধ হওয়া' বলিতে বাস্তবিক পক্ষে কি বুঝায়! ছঃখের বিষয় অনেকেরই এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নাই। সেইজন্য সিদ্ধভূমি সম্বন্ধে রহস্য বিজ্ঞান আলোচনা করার পূর্বে সিদ্ধাবস্থার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

আত্মা এবং দেহ এই দুটি শব্দের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত আছি। আমরা জানি আত্মা চৈতন্য স্বরূপ নিত্য বিভূ এবং শুদ্ধ, কিন্তু দেহ মায়িক বলিয়া অনিত্য পরিবর্তনশীল বিকারগ্রস্ত এবং মলিন। দেহ সাধারণতঃ পাঞ্চভৌতিক উপাদানে নির্মিত পিণ্ড বিশেষ, ইহাই সকলে জানেন। অবশ্য ইহা স্থূল দেহের কথা। ইহা খুবই সত্য। কিন্তু স্থূল ব্যতীত সূক্ষ্ম দেহও ত আছে। এই সূক্ষ্মদেহ স্থূল হইতে পৃথক হইলেও শুদ্ধ এবং নিত্য নহে। সূক্ষ্মদেহ এবং স্থূলদেহ উভয়ের অতীত কারণ দেহ সম্বন্ধেও শাস্ত্রে বহু সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ দেহের তুলনায় সূক্ষ্ম এবং স্থূল উভয়ই কার্য্য। অনেকে সূক্ষ্মদেহকে সপ্তদশ অবয়ব সম্পন্ন লিঙ্গ শরীর রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহাকে প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষের সমষ্টি রূপে বর্ণনা করেন। ইহা শুধু দৃষ্টিভেদের কথা। মৃত্যুর পর সাধারণতঃ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া

সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহই কর্ম্মানুসারে লোক লোকান্তরে সঞ্চরণ করে, অথবা কোন বিশিষ্ট লোকে বা স্থানে ভোগের জন্ত নিয়ত কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে। তাহার পর অবশিষ্ট কর্ম্মফল মানব-দেহে আসিয়া ভোগ করে। এই প্রকার সূক্ষ্মদেহের সহিত কারণ দেহেরও সম্বন্ধ আছে জানিতে হইবে। সাধারণতঃ সূক্ষ্মদেহের পৃষ্ঠে যেমন সূক্ষ্মদেহ বিद्यমান থাকিয়া সূক্ষ্মকে অনুপ্রাণিত করে, তেমনি সূক্ষ্মদেহের পিছনে কারণদেহ থাকিয়া সূক্ষ্মকে কার্য্যক্ষম করে। উপযুক্ত অবসর আসিলে সূক্ষ্ম হইতে কারণদেহ পৃথক্ হইয়া যায়। তারপর ঐ কারণদেহ অবস্থানুসারে পুনরায় সূক্ষ্মের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে। অবস্থার বৈচিত্র্য অসংখ্য। কিন্তু এই সব দেহই মায়িক। সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস কারণদেহের পরে আর দেহ নাই। এক দৃষ্টিতে নাই ইহা খুব সত্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কারণদেহের পরেও মহাকারণ দেহ আছে। সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, কারণ জড়দেহ এবং মহাকারণ ও জড়দেহ। কিন্তু উভয়ে পার্থক্য এই যে সূক্ষ্মাদি দেহত্রয় অশুদ্ধ ত্রিগুণাত্মক এবং মহাকারণদেহ জড় হইলেও অশুদ্ধ নহে। ইহা বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক। ইহাতে রজোগুণ ও তমোগুণের স্পর্শ থাকে না।

অনেকেই শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে যোগিগণ পূর্ণ-সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে মহাকারণ দেহও দেহের পর্য্যাবসান নহে। মহাকারণ দেহের পর আর সাকার সত্তা থাকিতে পারে না ইহাও সত্য নহে।

কারণ চিন্ময় দেহ অচিৎ স্পর্শ রহিত এবং উহা এক হিসাবে মহাকারণ দেহের ও পরবর্তী, তবে সাধারণ ধোণী চিন্ময় দেহ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। চিৎ কি প্রকারে দেহরূপে প্রতিভাসমান হয় অথবা দেহ কি প্রকারে চিন্ময় প্রাপ্ত হয় ইহা যোগ সাধনার গভীর রহস্য।

সন্তুগণ বলেন যে এই যে চিন্ময়দেহ যদি ইহা শুধু কৈবল্যাত্মক হয় তবে ইহারও একটি পরাবস্থা আছে। ঐ অবস্থাকে তাঁহারা হংসাবস্থা বলেন। অবশ্য এই শব্দটি সম্প্রদায় বিশেষের একটি পরিভাষা মাত্র। তবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ণ সত্যকে তত্ত্বরূপে বিভক্ত করিলে তত্ত্ব ও তত্ত্বাতীত রূপে দুইটি বিভাগ পাওয়া যায়। তত্ত্ব বলিতে চিৎ, অচিৎ উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং চিন্ময় দেহ যেমন তাত্ত্বিক দেহ জড় দেহও তেমনই তাত্ত্বিক দেহ। জড় দেহও শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে দুই প্রকার, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শুদ্ধ জড় দেহই মহাকারণ দেহের নামান্তর। অশুদ্ধ জড়দেহ কারণ ও কার্য্যভেদে দ্বিবিধ। কার্য্যদেহ সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে দ্বিবিধ।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ হইতে বুঝা যাইবে যে পূর্ববর্ণিত চিন্ময় দেহ পর্য্যন্ত যাবতীয় দেহই তাত্ত্বিক দেহ। কিন্তু যে দেহে শুদ্ধ তত্ত্ব ও অশুদ্ধ তত্ত্বের তাদাত্ম্য সিদ্ধ হয় অথচ যাহা তত্ত্বাতীত আত্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন তাহাই হংসস্বরূপ বা হংসদেহ। ইহাতে সবই আছে—শুদ্ধ আছে, অশুদ্ধও আছে, অচিৎও আছে, চিৎও আছে, যাবতীয় তত্ত্বই আছে অথচ তত্ত্বাতীতও

আছে। ইহাই পূর্ণ। ইহা দেহ হইয়াও আত্মা এবং আত্মা হইয়াও দেহ। তত্ত্বরূপে ইহা দেহ এবং তত্ত্বাতীত রূপে ইহাই আত্মা। এই অবস্থাটির প্রাপ্তির নাম দেহ সাধনা।

পূর্বের যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে এক হিসাবে কৈবল্যকেও দেহরূপে পরিগণিত করা যায় এবং করা হইয়া থাকে। যে দৃষ্টিতে কৈবল্য স্থিতি স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ হইতে মুক্তাবস্থা তাহা ঠিকই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে কৈবল্যদেহ নামেরও সার্থকতা আছে। কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্বরূপ দেহের বর্ণনা পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাহাও সত্য। কারণ ঐ দৃষ্টিতে স্বরূপ যেমন সচ্চিদানন্দরূপে গৃহীত হয় স্বরূপ দেহও তেমনই তদ্রূপেই গৃহীত হয়।

যোগ সাধনার পথে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার পূর্ণতার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যিক—‘আবিষ্কার’ কথাটি এইজন্ত বলিলাম যে ঐক্যটি প্রথম হইতেই আছে। আবরণের দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন আছে বলিয়া নিজের নিকট প্রকাশমান হয় না। যখন ক্রমশঃ এই সকল আবরণ সরিয়া যায় তখন অনাবৃত অথগু পরম সত্তা আত্মপ্রকাশ করে। তখন বৈচিত্র্যের প্রতীতি থাকে না। উহার অন্তরালস্থিত অদ্বৈত সত্তাটি মহাপ্রকাশরূপে আবরণ মুক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই মহাপ্রকাশটি ‘জ্ঞাননেত্র’ রূপে যোগীর নিকট প্রকাশিত হয় এবং যোগীকে পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে এবং অন্ত্যকালে পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। পূর্ণত্ব বলিতে শুধু প্রকাশকে বুঝায় না, যদিও মূলে

প্রকাশ ভিন্ন স্বরূপতঃ আর কিছুই নাই, কিন্তু ইহাতে বুঝায় প্রকাশ এবং ঘাহা কিছু অভিন্নরূপে প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা। প্রকাশ এবং প্রকাশের সহিত অভেদে প্রকাশমান সমগ্র বিশ্বই পূর্ণ সত্তার অন্তর্গত। পূর্ণেরও পূর্ণ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সত্তা বলিতে আমরা বুঝিয়া থাকি—মহাপ্রকাশ এবং তাহার সহিত অভেদ সম্বন্ধে, ভেদাভেদ সম্বন্ধে এবং ভেদ সম্বন্ধে স্থিত সমগ্র বিশ্ব। দেশ কাল প্রভৃতি সমস্তই ইহার অন্তর্গত। ইহাই পরিপূর্ণ সিদ্ধাবস্থা, যাহার নাম অখণ্ড সত্তা।

এবার আমরা সিদ্ধপুরুষের আলোচনা হইতে সিদ্ধভূমির আলোচনাতে অবতরণ করিব। সিদ্ধপুরুষ যে প্রকার চিৎ ও অচিৎ, কার্য্য ও কারণ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল অবস্থাতে অব্যাহত থাকিতে পারে এবং নিজের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতে পারে ঠিক সেই প্রকার সিদ্ধভূমিও জানিতে হইবে। দেহ সিদ্ধির অতিরিক্ত ভাবে ভূমিসিদ্ধির আবশ্যকতা হয় না। কারণ দেহসিদ্ধি হইলেই তদ্ অনুরূপ ভূমিরও সিদ্ধি হইয়া থাকে। দেহ যেমন স্থূলাভিমানী পুরুষের নিকট স্থূলরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ ঐ দেহের অনুরূপ ভূমিও তদ্ অভিমানীর নিকট তদ্রূপেই প্রতীত হয়! অর্থাৎ যে নিজের দেহকে স্থূল দেহরূপে অভিমান করে তাহার নিকট যে জগৎ প্রকাশিত হয় তাহাও স্থূল জগৎ রূপেই বর্ণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু যখন অভিমানী পুরুষ সূক্ষ্মদেহে অভিমান করে তখন তাহার নিকটে সমগ্র জগৎ সূক্ষ্মরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। স্থূল অভিমান তখন থাকে না

বলিয়া স্থূলরূপে তখন জগতের প্রতিভাস হয় না। এইরূপ অভিমানী দ্রষ্টা যখন নিজে চিদ্রূপে অবস্থিত হয়, নিজের স্থূল সূক্ষ্মাদি অচিৎ দেহের অভিমান যখন তাহাতে থাকে না, তখন তাহার নিকট জগতও অচিদৃভাব বিরহিত চিদ্রূপেই প্রতিভাসমান হয়। এই সকল কথা যোগীমাত্রেরই অনুভূত সত্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহার মূলে দ্রষ্টাকে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে সঞ্চরণ করিতে হয়। কারণ তাহা না হইলে তাহার দৃষ্টির অনুরূপ দৃশ্য জগতের উপলব্ধি হইতে পারে না। এই সকল অবস্থাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সেইজন্য এক অবস্থার সঙ্গে অন্য অবস্থার ঐক্য ত' নাই-ই, এমন কি যোগসূত্রও নাই। এইজন্য এই যোগসূত্রটি এবং চরমে ঐক্যটি আবিষ্কার করা মহাযোগীর লক্ষ্য। যখন এই পরম ঐক্য সূত্রটি অনুসন্ধানের পর প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাতে স্থিতিলাভ হয়, তখন তদনুরূপ ভাবে সমগ্র বিশ্ব অভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই অভিন্ন সত্তার মধ্যে প্রত্যেক ভূমিরই পৃথক সত্তা নিলীন রহিয়াছে। ইহার ফলে যোগী যখন যে ভূমি হইতে দৃষ্টি প্রসারণ করিবে তখন সেই ভূমিরই দৃশ্য সত্তা তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে। যোগীকে যেমন কোন ভূমিতে অবতরণ করিতে হয় না অথবা আরোহণ করিতে হয় না, তেমনই তাহার দৃশ্যভূমিও অবতরণ তথা আরোহণ হইতে নিমুক্ত ভাবে দ্রষ্টার অনুরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়। এই সাধারণ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক, নতুবা সিদ্ধভূমির রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে না।

সিদ্ধভূমি তত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ইহা হইল সৃষ্টির রহস্য। আমরা সাধারণ দৃষ্টি অনুসারে মনে করি বাহ্য জগৎ মূলতঃ জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত এবং ইন্দ্রিয়াদি করণ বর্গদ্বারা ইহার সংশ্রব সংঘটিত হইলে ইহার সত্তা উপলব্ধি গোচর হয়। তখন আমাদের জ্ঞান উক্ত জগতের আকারে উপরঞ্জিত হয় অথবা উক্ত আকার ধারণ করে। জ্ঞানের নিম্নভূমিতে ইহা খুবই সত্য। অর্থাৎ জ্ঞান হইতে জেয় পৃথক্। কিন্তু যোগপথে অগ্রসর হইতে হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইলে বুঝিতে পারা যায় যে জ্ঞান হইতে জেয় পৃথক্ নহে। জ্ঞানেরই আকার জ্ঞান হইতে পৃথক্ জেয়রূপে অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রতীত হয়। জ্ঞান ও জেয় মধ্যে জ্ঞান সাপেক্ষ নহে, কিন্তু জেয় সাপেক্ষ। ইহার পর আরও অগ্রসর হইলে অনুভব করিতে পারা যায় যে যেমন জ্ঞান হইতে জেয়ের পৃথক্ সত্তা নাই, তেমনই জ্ঞাতা হইতেও জ্ঞানের পৃথক্ সত্তা নাই। যেমন প্রদীপ হইতে আলোক রশ্মি নির্গত হয় তেমনি জ্ঞাতা হইতেই জ্ঞানরূপ আলোক মালা বিকীর্ণ হইয়া থাকে। এইজন্য জেয় অন্তর্মুখ অবস্থায় জ্ঞানে লীন হয় এবং আরও অন্তর্মুখ অবস্থায় জ্ঞানও জ্ঞাতাতে লীন হয়। এই জ্ঞাতা সৃষ্টির মূল বীজরূপে বিद्यমান থাকে। ইহাও যখন জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ অবস্থায় বিद्यমান থাকে তখন তাহাকেই শান্ত দার্শনিকগণ তুরীয় অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা ত্রিপুটী রহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অবস্থা। জ্ঞাতার যাহা দৃষ্টি এবং তদ্ অন্তর্গত দৃশ্য তাহাই ভোক্তা জীবের নিকট বাহ্য সৃষ্টিরূপে

প্রতিভাসমান হয়। সুতরাং যিনি দ্রষ্টা তিনি স্রষ্টা। এই সৃষ্টি দ্রষ্টার যে স্পন্দমাত্রা হইতে উদ্ভূত হয় তদপেক্ষা নিম্নমাত্রা সম্পন্ন দ্রষ্টার নিকট অথবা মায়িক প্রমাতার নিকট উহা বাহ্য সৃষ্টি বা ভূমিরূপে পরিগণিত হয়। আমাদের পরিচিত ব্রহ্মাণ্ড যেমন হিরণ্যগর্ভের বৈরাজ্য অভিমানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে তেমনি সিদ্ধ যোগী ঋষির নিজ নিজ অভিমানে তাঁহার দৃষ্টি ও দৃশ্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভূমি বা স্তর বিद्यমান রহিয়াছে। যে কোন ব্যক্তি ঐ অভিমানে যুক্ত ও উহার আশ্রিত তাহার পক্ষে ঐ সকল ভূমি বা ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর ও ব্যবহার যোগ্য হইয়া থাকে—সকলের পক্ষে নহে। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অভিমানের প্রসাররূপী ব্রহ্মাণ্ড যেমন প্রজাবর্গের নিকট বাহ্য ও সত্যরূপে প্রতীত হয় তেমনি ঐ সকল সিদ্ধ যুগি ঋষির দৃষ্টি ও অভিমানে বিদ্যুত ভূমি সকলও তাঁহাদের সংস্পর্শ যুক্ত ব্যক্তির নিকট বাহ্য ও সত্যরূপে অনুভূত হয়। এইগুলিকে সিদ্ধভূমি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। শুধু পৃথিবী কেন, ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিয়াও ইহাদের সন্ধান (geographical location) পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। অথচ ইহারা ঠিক এই পৃথিবীরই মতন ব্যবহার যোগ্য ও সত্য। বৌদ্ধগণ যে সব বুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা বলিয়া থাকেন সে সকলও এই জাতীয় ভূমি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সিদ্ধভূমির আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝিতে পারা গেল যে সিদ্ধ আত্মার ইচ্ছানুসারে তথাকথিত সিদ্ধভূমির আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি সিদ্ধ আত্মা হইতে যে এই প্রকার ভূমির

আবির্ভাব হয় তাহা বলা যায় না। কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে সিদ্ধ আত্মার ভূমি সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছার মূলে আছে কোন প্রকারের শুদ্ধ বাসনা। শুদ্ধ বাসনা বাসনা হইলেও অশুদ্ধ মায়িক বাসনা হইতে পৃথক্। অবশ্য শুদ্ধ মায়ী এবং অশুদ্ধ মায়ীতে ভেদ আছে ইহা সত্য এবং তদনুসারে উভয় ক্ষেত্রের বাসনাতেও ভেদ আছে, তাহা বলিতে হইবে। অশুদ্ধ মায়ীর বাসনার মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্যক্তিগত অথবা ব্যক্তিগত ভোগাকাঙ্ক্ষা অথবা মুক্তি আকাঙ্ক্ষা। অহংকার ও মমকার এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু যখন এই ব্যক্তিগত সীমা লঙ্ঘিত হইয়া এক একটি ব্যাপক সীমার আবির্ভাব হয় তখন ঐ ব্যাপক সীমাও পূর্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন সীমার স্থায় গণ্ডি রচনা করিয়া থাকে। অথচ পূর্ববর্তী গণ্ডির স্বার্থের তুলনায় এই বৃহত্তর গণ্ডির স্বার্থ এক প্রকার পরার্থ বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য। কিন্তু এই বৃহত্তর গণ্ডির তুলনাতেও অধিকতর ব্যাপক গণ্ডি আছে। তদ্রূপ ঐ ক্ষেত্রেরও নিয়ামক একটি কেন্দ্র আছে। এই প্রকারে এই শুদ্ধ ক্ষেত্রেরও যেটি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক রূপ তাহাই সিদ্ধভূমির সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এই সিদ্ধভূমি খণ্ড কালের রাজ্যরূপে পরিগণিত না হইলেও মহাকালের অতীত নহে। সেইজন্য শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধভূমিরও আবির্ভাব তিরোভাব অস্বীকার করা যায় না।

প্রত্যেকটি সিদ্ধভূমিরই দেশ ও কালের মান পৃথক্ পৃথক্। এই সব ভূমি মহাকালের অন্তর্গত হইলেও খণ্ডকালের ক্রিয়া

হইতে মুক্ত। এই সব ভূমিতে আবির্ভাব আছে, তিরোভাব আছে এবং অন্তরালে আছে স্থিতি। এই স্থিতিতে অবাস্তর স্থূল কালক্রম অনুভূত হয় না। সূক্ষ্ম ক্ষণিকক্রম অবশ্যই থাকে। কারণ তাহা না থাকিলে আবির্ভাবের পর যত দীর্ঘকালের পরে হোক না কেন তিরোভাব ঘটিত না। সুতরাং জানিতে হইবে যে এই সকল ভূমিতে বাহ্য দৃষ্টি অনুসারে স্থিতি এক প্রকারই প্রায় থাকে। তাই এই সকল ভূমির দেহাদিতে বালা, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ইত্যাকার অবস্থা ভেদ লক্ষিত হয় না। অর্থাৎ দেহাদি জরাবিহীন। মৃত্যু না থাকিলেও তিরোধান আছে এবং সঙ্কোচ ও বিকাশের ক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে। এইখানকার আত্মা যে দেহ আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে ঐ দেহ ঐ ভূমির স্থিতিকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বৎসর ঠিক একভাবেই থাকে, তাহাতে বিকৃতি ঘটে না। যে সকল মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়া আধিকারিক অবস্থা লাভ করেন তাঁহারা এই সকল সিদ্ধভূমির অধিষ্ঠাতা হন। অধিকার বাসনা যাহাদের নাই তাঁহারা সিদ্ধভূমিতে থাকিয়াও না থাকার সমান। অথবা তাঁহারা সিদ্ধভূমি হইতে উর্দ্ধে অবস্থান করেন। আমাদের শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার সংস্পৃষ্ট সম্প্রদায় যাহাকে আসনের কৰ্ম বলিতেন সেই জাতীয় কৰ্মের ফলেই এই প্রকার সিদ্ধভূমিতে গতি এবং স্থিতিলাভ হয়। যাহাদের আসনের কৰ্ম থাকে তাঁহারাই এই সকল ভূমিতে স্থান লাভ করেন। তদনন্তর নিজের কৰ্মজনিত উৎকর্ষের ফলে নিজের স্থিতিতে উন্নতি লাভ করেন। যাহাদের আসনের কৰ্ম থাকে না তাহাদের পক্ষে এই জাতীয় সিদ্ধভূমিতে

আবির্ভাব হয় তাহা বলা যায় না। কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে সিদ্ধ আত্মার ভূমি সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছার মূলে আছে কোন প্রকারের শুদ্ধ বাসনা। শুদ্ধ বাসনা বাসনা হইলেও অশুদ্ধ মায়িক বাসনা হইতে পৃথক্। অবশ্য শুদ্ধ মায়ী এবং অশুদ্ধ মায়ীতে ভেদ আছে ইহা সত্য এবং তদনুসারে উভয় ক্ষেত্রের বাসনাতেও ভেদ আছে, তাহা বলিতে হইবে। অশুদ্ধ মায়ার বাসনার মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্যক্তিগত অথবা ব্যক্তিগত ভোগাকাঙ্ক্ষা অথবা মুক্তি আকাঙ্ক্ষা। অহংকার ও মমকার এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু যখন এই ব্যক্তিগত সীমা লঙ্ঘিত হইয়া এক একটি ব্যাপক সীমার আবির্ভাব হয় তখন ঐ ব্যাপক সীমাও পূর্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন সীমার ন্যায় গণ্ডি রচনা করিয়া থাকে। অথচ পূর্ববর্তী গণ্ডির স্বার্থের তুলনায় এই বৃহত্তর গণ্ডির স্বার্থ এক প্রকার পরার্থ বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য। কিন্তু এই বৃহত্তর গণ্ডির তুলনাতেও অধিকতর ব্যাপক গণ্ডি আছে। তদ্রূপ ঐ ক্ষেত্রেরও নিয়ামক একটি কেন্দ্র আছে। এই প্রকারে এই শুদ্ধ ক্ষেত্রেরও যেটি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক রূপ তাহাই সিদ্ধভূমির সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এই সিদ্ধভূমি খণ্ড কালের রাজ্যরূপে পরিগণিত না হইলেও মহাকালের অতীত নহে। সেইজন্য শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধভূমিরও আবির্ভাব তিরোভাব অস্বীকার করা যায় না।

প্রত্যেকটি সিদ্ধভূমিরই দেশ ও কালের মান পৃথক্ পৃথক্। এই সব ভূমি মহাকালের অন্তর্গত হইলেও খণ্ডকালের ক্রিয়া

হইতে মুক্ত। এই সব ভূমিতে আবির্ভাব আছে, তিরোভাব আছে এবং অন্তরালে আছে স্থিতি। এই স্থিতিতে অবাস্তুর স্থূল কালক্রম অনুভূত হয় না। সুক্ষ্ম ক্ষণিকক্রম অবশ্যই থাকে। কারণ তাহা না থাকিলে আবির্ভাবের পর যত দীর্ঘকালের পরে হোক না কেন তিরোভাব ঘটিত না। সুতরাং জানিতে হইবে যে এই সকল ভূমিতে বাহ্য দৃষ্টি অনুসারে স্থিতি এক প্রকারই প্রায় থাকে। তাই এই সকল ভূমির দেহাদিতে বালা, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ইত্যাকার অবস্থা ভেদ লক্ষিত হয় না। অর্থাৎ দেহাদি জরাবিহীন। মৃত্যু না থাকিলেও তিরোধান আছে এবং সঙ্কোচ ও বিকাশের ক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে। এইখানকার আত্মা যে দেহ আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে ঐ দেহ ঐ ভূমির স্থিতিকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বৎসর ঠিক একভাবেই থাকে, তাহাতে বিকৃতি ঘটে না। যে সকল মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়া আধিকারিক অবস্থা লাভ করেন তাঁহারা এই সকল সিদ্ধভূমির অধিষ্ঠাতা হন। অধিকার বাসনা যাহাদের নাই তাঁহারা সিদ্ধভূমিতে থাকিয়াও না থাকার সমান। অথবা তাঁহারা সিদ্ধভূমি হইতে উদ্ধে অবস্থান করেন। আমাদের শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার সংসৃষ্ট সম্প্রদায় যাহাকে আসনের কৰ্ম বলিতেন সেই জাতীয় কৰ্মের ফলেই এই প্রকার সিদ্ধভূমিতে গতি এবং স্থিতিলাভ হয়। যাহাদের আসনের কৰ্ম থাকে তাঁহারাই এই সকল ভূমিতে স্থান লাভ করেন। তদনন্তর নিজের কৰ্মজনিত উৎকর্ষের ফলে নিজের স্থিতিতে উন্নতি লাভ করেন। যাহাদের আসনের কৰ্ম থাকে না তাহাদের পক্ষে এই জাতীয় সিদ্ধভূমিতে

প্রবেশ এবং ভূমি-প্রবিষ্ট অবস্থায় কর্ম সম্পাদন অসম্ভব। প্রাচীন কালে বৌদ্ধগণও এ রহস্য জানিতেন এবং এইজন্য তাঁহারা ভূমি-প্রবিষ্ট প্রজ্ঞাকে সমাধিজনিত প্রজ্ঞা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। ইহাই ছিল ঐ সময়কার হীনযান হইতে মহাযানের উৎকর্ষের কারণ।

বিশ্ব-রচয়িতার বিধানে সর্বত্রই এই প্রকার সিদ্ধভূমির বাবস্থা রহিয়াছে, ইহা না থাকিলে কালের জগত হইতে মুক্ত করিয়া কাহাকেও আশ্রয় দান এবং কর্মপথে পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ দান অসম্ভব। এই জাতীয় সিদ্ধভূমি কোন কোন স্থানে দিব্য ভূমিরূপেও বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা মায়িক ভূমিতেও আছে এবং মায়াতীত মহামায়ার ভূমিতেও আছে। এই সকল ভূমির অধিষ্ঠাতা সকলেই এক হিসাবে সজ্জাতীয় হইলেও পরস্পর পৃথক্। এই পৃথক্ ভাবের উপরেই তাঁহার অধিকার ক্ষেত্রে স্থিতি নির্ভর করে।

সিদ্ধভূমির যিনি অধিষ্ঠাতা তাঁহার দৃষ্টি সাধারণতঃ বহিমুখ এবং অন্তর্মুখ অর্থাৎ উভয় মুখ হইয়া থাকে, অথবা শুধুই বহিমুখ এমনও হইতে পারে, কিন্তু উহা শুধুই অন্তর্মুখ একরূপ হওয়া সম্ভব হয় না। কারণ তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্মুখ হইলে ভূমি কাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইবে? সুতরাং তাঁহার দৃষ্টি বহিমুখ অথবা বহিমুখ হইয়াও আংশিক রূপে অন্তর্মুখ ইহাই যুক্তি সঙ্গত। মানব দেহে আত্মা চক্রের যে স্থান

বিশ্ব রচনাতে সিদ্ধভূমিরও কতকটা সেই প্রকার স্থান। আজ্ঞা-চক্র দ্বিদল বলিয়া এবং বিন্দু স্থানে অবস্থিত বলিয়া একদিকে যেমন অধোবর্তী প্রদেশে ক্রিয়াশীল অপর দিকে তেমনি সহস্রদলের দিকেও ক্রিয়াশীল। দিবা ও রাত্রির অন্তরালবর্তী সন্ধ্যা যেমন মধ্যস্থ, তেমনি সহস্রদল ও ষট্চক্রের অন্তরালে আজ্ঞা-চক্রও জানিতে হইবে। সমষ্টি জগতে সিদ্ধভূমিও এই প্রকার একদিকে যেমন অপূর্ণ সংসারের দিকে অভিগুথ, অন্যদিকে সেই প্রকার পূর্ণের দিকেও অভিগুথ।

সিদ্ধভূমি চিন্তের একাগ্র ভূমিতে স্থাপিত এবং জ্ঞানময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই সাধক ও যোগীর চরম লক্ষ্য নহে। কারণ একাগ্রতা চিন্তের বিকাশের পূর্ণ পরিণতি নহে। চিত্ত একাগ্রতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যোগভূমিতে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু যোগের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইতে হইলে একাগ্রতা লব্ধ জ্ঞানকেও নিরুদ্ধ করিতে হয়। জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করিয়া নিজ সত্তার সার্থকতা সম্পাদন করে। কিন্তু অজ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গেই সত্যের পূর্ণ প্রকাশ হয় এবং তখন জ্ঞান সফলতা লাভ করিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই জ্ঞানাতীত সত্যের প্রকাশই যোগের প্রকৃত লক্ষণ। এই সত্য আত্মা স্বয়ং এবং ইহা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া সর্বদাই নিজের নিকট নিজে প্রকাশমান থাকেন। সিদ্ধভূমি হইতে বিদ্যাতের চমকের মতন এই স্ব-প্রকাশ সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।

কিন্তু ইহা মনুষ্যের অধ্যাত্ম জীবনের চরম লক্ষ্য নহে। চরম

লক্ষ্য হইল আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ। আত্মসাক্ষাৎকার তাহার উপায়, কারণ আত্মার অনাবৃত স্বরূপ দর্শন করিতে না পারিলে তাহাতে স্থিতিলাভ কি প্রকারে হইবে? স্বরূপ-স্থিতি দেশ ও কালের অতীত, এমন কি মহাকালেরও অতীত। জ্ঞানের রাজ্য হইতে স্বরূপ স্থিতির আভাসটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাকে সত্যরূপে পাইতে হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ের অতীত হইতে হয়। তাহা না হইলে চৈতন্য-স্বরূপ মাতৃ-অঙ্কে প্রবেশ লাভ ঘটে না। স্বরূপ স্থিতিতে চিত্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া না-থাকার মতন হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় আত্মা পরমশিবরূপী এবং তাঁহার শক্তি পরাশক্তিরূপা। উভয়ে কোন ভেদ থাকে না। ইহাই স্বাতন্ত্র্যময় বোধ অথবা বোধময় স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা।

আত্মা স্বতন্ত্র এবং স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—পরাশক্তি তাঁহার সহিত অভিন্ন, পরাপরা শক্তি তাঁহার সহিত অভিন্ন হইলেও তাহা হইতে পৃথক্ এবং অপরা শক্তি তাহা হইতে ভিন্ন বা পৃথক্। এই সকল শক্তি লইয়া তিনি নিত্য লীলাতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। স্বরূপতঃ তিনি নিষ্ক্রিয় বলিয়া লীলাতীত হইলেও স্বরূপ শক্তির প্রভাবে নিত্যই লীলাময়। এই লীলা অভেদের বা প্রেমের লীলা, ভেদাভেদের অথবা জীবশক্তির লীলা এবং ভেদময় মায়া লীলা—এক সঙ্গে সবই। তিনি অস্পন্দ হইয়াও শক্তি বশতঃ নিত্য স্পন্দময় এবং প্রতিফলনে স্পন্দনশীল হইয়াও সদাই কূটস্থ ও অস্পন্দ।

সিদ্ধভূমি সিদ্ধপুরুষের নাম অনুসারে অথবা অন্য কোন প্রকার নিয়মের অধীনে বিভিন্ন নাম ও রূপ লইয়া শ্রীভগবানের বিশ্ব লীলায় আপন আপন কার্য্য করিয়া থাকে । প্রসিদ্ধি আছে দত্তাত্রেয়, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রাদি ঋষিবর্গ নিজ নিজ সিদ্ধ আশ্রম স্থাপন করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার করিতেছেন । সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য কালরাজ্যের জীব সমূহকে যে কোন প্রকারেই হোক কালের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তি ও আনন্দময় নিজ ধামে ষথাসম্ভব দীর্ঘকাল আশ্রয় দান করা । যদিও এই মহান্ ব্যাপারে ধর্ম্মের একটি সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি ইহা সনাতন ধর্ম্মের, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ মানব ধর্ম্মের, পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র নহে । কারণ কর্ম্মক্ষেত্র কালের রাজ্যে ভিন্ন অন্ত্র অবস্থিত হইতে পারে না । তাই সিদ্ধভূমির মধ্যেও অবান্তর বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় । কারণ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ প্রাপ্ত হইয়া প্রারন্ধ্রান্তে খণ্ড কালের দেহ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মভূমিময় সিদ্ধভূমিতে আগমন করিলে কালরাজ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত থাকে । অবশ্য ইহা সত্য যে কালরাজ্যে কর্ম্মের পরিণতি ক্ষিপ্ত হয়, সিদ্ধ কর্ম্মভূমিতে উহা কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হয় । কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রকার সিদ্ধভূমিও আছে । সেগুলি কর্ম্মভূমি নয় বলিয়া কর্ম্মের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা অনিবৃত্তই থাকিয়া যায় । ভাবপ্রধান, জ্ঞান-প্রধান এবং ঐ প্রকার অন্যান্য গুণসম্পদ-বিশিষ্ট সিদ্ধভূমিও আছে ।

শ্রীশ্রীগুরু-স্মরণে

শ্রীমোহিনীমোহন সান্যাল

ক্ষণিকের তরে হৃদয় আসনে

বসায়ৈ যদি গো থাকি,

জানি আমি কভু হবেনা বিমুখ,

দিবে নাকো মোরে ফাঁকি ।

প্রাণের অশ্রু যদি দিয়ে থাকি

তোমারই ঐ চরণ কমলে

কৃপা ক'রে তুমি করিবে গ্রহণ,

যাবে না আমারে ভুলে ।

তোমার প্রকাশে আমি বিকসিত,

চরণে দিয়েছ ঠাঁই

“আমার” বলিতে তুমি আছ শুধু—

আর কেহ মোর নাই ।

পরম পূজ্য মাতাপিতা দেব,

তুমি জ্ঞানদাতা মম,

চির সুন্দর ভুবন মাঝারে

ইষ্টমূর্তি অনুপম ।

জনমে মরণে সঁপিয়াছি প্রাণ,

তুমি যে অগতির গতি,

হে দীন দয়াল জানিয়াছি সার

অধম-শরণাগতি ।

শ্রী শ্রী বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ

শ্রীকনীন্দ্রনাথ ঘোষ

গত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমি কোচবিহারে জেন্‌কিলস্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে (third class) পড়িতাম। আমার বাবা ৩নরেন্দ্রনাথ ঘোষ কোচবিহারের মহারাজার আফিসে হেড্ অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকুরি করিতেছিলেন। ঐ বয়সেই আমার Spiritualism সম্বন্ধীয় বই পড়িতে ভাল লাগিত। ঐ বৎসরে আমার ভগিনীপতি ৩কেশদারনাথ সিংহ গুপ্তরা আশ্রমে গিয়া উক্ত পরমহংসদেবের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া যোগের ক্রিয়া করিতেন। তিনি উক্ত পরমহংসদেবকে কামাখ্যাধাম হইতে আমাদের কোচবিহারের বাসায় লইয়া আসেন। দুই দিন ও দুই রাত্রি ধরিয়া আমাদের বাসায় গুরুদেব ছিলেন,—আমার মা ও দিদিকে ঐ সময়ে তিনি দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাথার ভিতর হইতে বাণলিঙ্গ ও নারায়ণশিলা বাহির করিয়া গঙ্গাজলে স্নান করাইবার পর পূজা করিয়া দীক্ষাদান করেন। ছপুর্বে আহারের পর তিনি আমার ভগিনীপতির ঘরে একথানা চৌকির উপর বসিয়া আমার সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল, খুব গরম। আমি তাঁহাকে বলিলাম, “এখন পাওয়া যায় না এমন একটা ফল খাওয়াইতে হইবে,—কাশ্মীরের গাছপাকা সবুজ লম্বাটে পাকা

আঙ্গুর খাওয়াইতে হইবে।” তিনি বলিলেন, “তোমার আবদার ত কম নয়? এ অসময়ে আঙ্গুর কোথায় পাব?” আমি তত্বত্বরে বলিলাম, “আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আপনাকে আঙ্গুর খাওয়াইতেই হইবে।” তিনি বলিলেন, “দাঁড়া দেখি, কোথায় পাই।” তাঁহাকে ঘিরিয়া আমার মা, দিদি, ভগিনীপতি, ভাগিনেয়ী, সেজদাদা, ছোটদাদা উপস্থিত ছিলেন।” পরমহংসদেব বলিলেন, “সব চুপ করে বসো।” এক হইতে পাঁচ অবধি গণিতে যে সময় লাগে ততটুকু সময় ধরিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, “কাশ্মীরের গাছপাকা আঙ্গুর খা, নে। কত খাবি, নে।” আমাদের প্রত্যেককে ছুটো করে গাছপাকা আঙ্গুর পাতা সমেত খাইতে দিলেন। প্রত্যেকে খাইয়া অবাক হইয়া গেলাম ও খুব তৃপ্তিলাভ করিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই আঙ্গুর কোথায় পাইলেন? কি ভাবে আনিলেন?” পরমহংসদেব বলিলেন, “এখান হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, কাশ্মীরের এক উপত্যকায় আঙ্গুর লতার বন হইয়া আছে, সেখানে কোন মানুষ এ ঘাবৎ পদার্পণ করে নাই। ইচ্ছামাত্রই ঐ আঙ্গুর হাতে আসিয়া পৌঁছাইল। এখন ইচ্ছা করিলে সব আঙ্গুর উজাড় করিয়া আনা যায়।” আরও বলিলেন, “উহার মালিক কেহ নাই বলিয়া ঐ আঙ্গুর ফলের দাম দিতে হইল না। এখন বল কি কি গন্ধ চাস্।” গোলাপ, যুঁই, বেলা প্রভৃতির গন্ধ চাওয়ায় তিনি সিক্কের রুমালে ও আমাদের হাতে ঐ সব গন্ধ দিলেন। তখন তাঁহার শরীর হইতে পদ্মগন্ধ সর্বদাই বাহির হইত। তিনি বলিলেন,

“পরমহংস অবস্থা লাভ হইলে মানুষের মধ্যে ভগবৎ শক্তি প্রকট হয় এবং অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় যথা—অগ্নিমা, লঘিমা, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ প্রভৃতি। যোগীর নিকট অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। আমি চলিয়া গেলে এখানে বৃষ্টি হবে, তাহার আগে না।” প্রকৃতপক্ষে তিনি কোচবিহার হইতে চলিয়া যাইবার পর বৃষ্টি হইয়াছিল।

তৎপরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পর আমি, আমার ভগিনীপতি, দিদি, ভাগিনেয়ী সুহাসিনী ঘোষ বর্দ্ধমানের আশ্রমে প্রায় পনের দিন থাকাকালে আমরা পরমহংসদেবের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাঠিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, “লেখাপড়া শেষ হইবার পর তোকে দীক্ষা দিব।” আশ্রমে দুর্গাদাদা ও তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিয়াছিলাম। পূজনীয় পরমহংসদেব সূর্য্যবিজ্ঞানের সাহায্যে লেন্স দ্বারা বিভিন্ন গন্ধের সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

তৎপরে আমি আই.এস.সি. পাশ করিয়া কলিকাতায় বি.এস.সি. পড়িতে আসি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে। জন্মাষ্টমীর দিন বর্দ্ধমান আশ্রমে প্রত্যেক বৎসর যাইতাম এবং ছবিও তুলিতাম। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জন্মাষ্টমীর সময় বর্দ্ধমান আশ্রমে পরমহংসদেবের মাথায় একটা কাপড় জড়ান ছবি তুলিয়াছিলাম। তাহার এক কপি গোপীনাথ দাদা মহাশয়কে দিয়াছিলাম। সেই সময়ে যে ছবিখানা গ্রুপ ছবি তুলিয়াছিলাম তাহার একখানিও নাই। তৎপরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমি সাব্‌ডেপুটি কালেক্টার পদে নিযুক্ত হইবার

পর চুঁচুড়ায় থাকি। তখন আমার ভগিনীপতি ৬কেদারনাথ সিংহ পূজনীয় গুরুদেবকে কলিকাতা হইতে মটরযোগে আমাদের বর্ধমানের বাসাতে আনিয়াছিলেন। তৎপূর্ব ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আমি গুরুদেবের নিকট হইতে বর্ধমান আশ্রমে দীক্ষালাভ করিয়া-ছিলাম। চুঁচুড়ায় থাকার দিন আমাকে ও আমার ভাগিনেস্বীকে সূর্য্য-বিজ্ঞান দ্বারা গোলাপ গন্ধ তৈয়ারী করা শিখাইয়াছিলেন। তিনি চন্দ্ররশ্মি হইতে গন্ধ তৈয়ারী করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এ সময়ে আমার ভগিনীপতি Planchette এর খুব নিন্দা করায় গুরুদেব এক আঙ্গুলে ঐ যন্ত্র ধরিয়া ৬শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও ৬শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর আত্মাকে ঐ যন্ত্রে আনাইয়া তাঁহাদের বাণী কাগজে লেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন “পরলোকের তথ্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানিবার জন্য ঐ যন্ত্রে উচ্চ স্তরের আত্মাকে আনান ভাল।” গুরুদেব আমার ভগিনীপতিকে বলিলেন, “মামা ভাগ্নেতে এই যন্ত্র ধরিয়া বহু জিনিষ পরলোকের মহাপুরুষদের নিকট জানিতে পারিবে, ইহাতে দোষ নাই জানিবে।” ঐ দিন আমাকে চন্দন হইতে ধবলের ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী শিখাইয়াছিলেন। Planchette এ কে কে আসিয়া আমাদিগকে কি কি বিষয় বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রয়োজন হইলে অগ্র প্রবন্ধে লিখিব।

তৎপরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমাকে যে মহাপুরুষ প্রণবধ্বনি ও শব্দব্রহ্ম শোনাইয়াছিলেন, ব্রহ্মজ্যোতি ও বিন্দু দেখাইয়াছিলেন

তাহার বর্ণনা পূর্বের দিয়াছি। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে আরামবাগে থাকা কালে আমার আসল বসন্ত হয়। আমার স্ত্রী খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয় রাত্রে সে দেখে যে সেই মহাপুরুষ আমার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিতেছেন, “ভয় নাই। কঁাদছিস কেন? ভাল হইয়া যাইবে। ফণীর অনেক কাজ বাকী আছে।” তৎপরে আমি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করি।

তৎপরে আমি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে রাণীগঞ্জে বদলী হইয়া যাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই আমি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হই। জ্বর কিছুতেই ছাড়ে নাই। ডাক্তার প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় আমার চিকিৎসা করিতে ছিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর আমার শরীর খুব খারাপ বোধ হইতে থাকে। আমার অবস্থা খারাপ দেখিয়া আমার স্ত্রী ও দিদি শামুড়ী একজন প্রবীণ ডাক্তারকে আনিতে পাঠান। আমি জ্ঞান হারাইলাম। শরীরের চৈতন্যশক্তি গুটাইয়া মস্তিষ্কের দিকে যাইতে লাগিল। আমি বুঝিলাম যে আমার মৃত্যু হইতেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি চোখ বুজিয়াই দেখি যে সেই সুন্দর খুব ফরসা কিশোর বয়স্ক (১৬ বৎসর) মহাপুরুষ আমার চোঁকির উপর বামদিকে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। আমি বলিলাম, “আমি ত বাবা, মরিতেছি। ছোট দুইটি মেয়েকে রাখিয়া যাইতেছি তাহাদের কি হইবে জানি না।” তিনি বলিলেন, “ঐ সামনে দেখ।” আমি দেখিলাম যে একটি অপাখিব

অপরূপ সুন্দর বাগানে আমার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া
 আছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবের সহিত শ্রীমদ্ভগবদগীতার
 প্রত্যেক শ্লোক বাহির হইতেছে। মন প্রাণ সব কেড়ে নেয়, অতুলনীয়
 মধুর সুর। ঐ সুর ছাড়া জগতে আর কোন সুর বা শব্দ নাই।
 মহাপুরুষ বলিলেন, “শুনিলে ও দেখিলে ত? এইবার তোমার
 শরীরে ফিরিয়া ঘাও। তুমি মরিবে না। এখনও অনেক কাজ
 বাকী আছে।” তাহার পর আমার চেতনা হইল ও শুনলাম,
 “মানুষের 109° temperature হইলে ত বাঁচে না। Thermo-
 meter টা ভুল। সকালে তো এই thermometer দিয়া ও
 আমার thermometer দিয়া একই temperature 103°
 পাইয়াছিলাম।” এই কথাগুলি আমার ডাক্তার প্রফুল্লকুমার
 মুখোপাধ্যায়কে বলিতে শুনলাম। আমি বলিলাম, “ডাক্তার
 বাবু, আমি মরি নাই, মরিব না। কোন ঔষধ দিবেন না।
 মাথায় কেবল ice-bag দিলে চলিবে।” তৎপর দিন বর্দ্ধমান
 সহর হইতে আমার শ্বশুর মহাশয়ের বন্ধু ডাক্তার বাসুদেব
 চক্রবর্তীকে রাণীগঞ্জে আনা হয়, তাঁহার সহিত আমি ট্রেনে
 বসিয়া বর্দ্ধমানে শ্বশুর বাড়ীতে আসি এবং একুশ দিনের মধ্যে
 সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করি। তখন হইতে প্রত্যহ গীতা
 পাঠের আদেশ পাই। ক্রিয়া করিতে বসিলেই এবং মন স্থির
 করিলেই ‘ঝাঁঝি’ পোকার ডাক, দীর্ঘ ঘণ্টাধ্বনি, মৌমাছির
 গুঞ্জনধ্বনি বা বংশীধ্বনি শুনিতে পাই। কয়েক বৎসর আগে ঐ
 ধ্বনি শ্রবণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমান বৎসরের (১৯৬৪
 খৃষ্টাব্দের) প্রারম্ভ হইতে আবার ঐ সব ধ্বনি ভাল ভাবে প্রকট

হইয়াছে। ঈষ্টদেবের কৃপা ভাল ভাবে অনুভব করিতেছি এবং একাগ্রতা দিন দিন বাড়িতেছে।

তৎপর পুনরায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমার প্রবল জ্বর আসে। আমার ছেলে temperature লইয়া আমাকে বা তাঁহার মাকে বলে নাই যে temperature কত। ছেলে তাড়াতাড়ি আমার প্রতিবেশী ডাক্তার বাসুদেব চক্রবর্তীকে আনিতে ছুটিল। তখন আমি বর্ধমানের বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বাস করিতেছিলাম। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি আমাকে দুই পুরিয়া ঔষধ দিলেন এবং বলিলেন, যে প্রথম পুরিয়া খাইবার আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘুম আসিবে এবং সকালে ছাড়িয়া যাইবে। তাঁহার সামনেই এক পুরিয়া ঔষধ খাইবার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলাম। সেই মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলাম আমার ঘরে। তিনি বলিলেন, “ভয় নাই, কালই প্রাতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। যোগমার্গে শরীরের এই রকম কষ্ট হয়।” ভোর পাঁচটার সময় আমার ঘুম ভাঙায় আমার স্ত্রী ও ছেলেকে ডাকিয়া বলিলাম, “দেখ আমার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।” Temperature লইয়া দেখা গেল 97°.9—উহাই আমার দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ।

আমি সর্বদাই অনুভব করি তিনি আমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেছেন।

আমি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর পেন্সেন লইবার পর গভর্ণমেন্ট আমাকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ অবধি পুনরায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৩১শে মার্চ অবসর লইবার

পর আমি ও আমার স্ত্রী খুব চিন্তিত হইয়া পড়ি। গুরুদেবকে কায়মনে আমার এই অবস্থার বিষয় জানাই। একদিন হঠাৎ তিনি স্মৃষ্ণভাবে আসিয়া বলিলেন, “ফণী, ভাবিও না, শীঘ্রই কোন দেবালয়ে তোমার চাকুরি হইবে।” তাহার পর এক মাসের মধ্যেই কলিকাতায় ভূকৈলাস দেবোত্তর এণ্টেটে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলাম। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাস হইতে আজ অবধি ঐ কার্য্যই করিতেছি।

পূজনীয় গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে দুইটি ঘটনা লেখা দরকার। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমি বর্ধমানের আশ্রমে কোন এক রবিবারে যাই। গুরুদেব আমাকে দুইটি stoppered শিশি দিয়া বলিলেন, “তুই ত বৈজ্ঞানিক, কোন্টা কি বল দেখি।” আমি পর পর দুইটি শিশির গন্ধ শুঁকিয়া বলিলাম, দুইটির মধ্যে পার্থক্য ধরা অসম্ভব। তবে দুইটি বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়।” গুরুদেব বলিলেন, “ইহা ত্রীকুম্ভের গায়ের গন্ধ। একটি ইচ্ছাশক্তির বলে প্রস্তুত ও অপরটি সূর্য্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রস্তুত।” সেই সময় গুরুদেবের গায়ে মাছি মশা বসিলে মরিয়া যাইত। তৎপরে আমাকে বলিলেন, “সূর্য্য-বিজ্ঞানের চর্চা করিও। সামান্য ত শিখাইয়া দিয়াছি।” আমি বলিলাম, “আমার ও আমার ভাগেনেয়ীর চেষ্টাতে দুইদিন গোলাপ গন্ধ তৈয়ারী করিতে পারিয়াছি।” বাবা বলিলেন, “লাগিয়া থাক।”

তৎপরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গুরুদেব কুণ্ডুরোগে যোগেশ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে। সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই।

আমার সঙ্গে ৩উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ছিলেন—তখন আমি বিষ্ণুপুরে থাকিতাম এবং দত্ত মহাশয় এস. ডি. ও ছিলেন। দত্ত মহাশয় গুরুদেবের গায়ের চামড়া ভেদ করিয়া ফটিকের দানা পড়িতে দেখায় এবং ঐ দানা শরীরের চামড়ার তলে প্রবেশ করাইয়া দিতে দেখায় আশ্চর্য্যাবিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি দীক্ষা লন নাই।

তৎপরে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আমি সঙ্গীক কাশীধামে গিয়াছিলাম। পূজনীয় গোপীনাথ দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আশ্রমে গিয়া দেখি যে পূজনীয় গুরুদেবের শরীর খুব কুশ ও দুর্বল। আমি বলিলাম, “আপনার কি কোন অসুখ করিয়াছিল?” তিনি বলিলেন, “হাঁ, খুব কঠিন অসুখ হইয়াছিল। তুই জানিস্ না?” আমি উত্তরে বলিলাম, “না, আমি ত তাহা জানি না। সূর্য্য-বিজ্ঞান মন্দির কি শেষ হইয়াছে।” বাবা বলিলেন, “উহা আর শেষ করিয়া যাইতে পারিলাম না। এই দেহ আর বেশীদিন থাকিবে না। ফ্রান্স হইতে চিঠি আসিয়াছে যে ছয় ফুট লম্বা রঙীন এক ইঞ্চি পুরু কাচ বায়ুবিন্দু (air bubble) বিহীন করা সম্ভব নহে। প্রত্যেক কাচের দাম দুই হাজার টাকার বেশী চাহিয়াছে। অতএব ঐ বিজ্ঞান-মন্দির পড়িয়া রহিল। তবে নবমুণ্ডীর আসন একটি অভিনব জিনিষ করিয়া রাখিয়া গেলাম। তাহার মাহাত্ম্য ভবিষ্যতে ছড়াইয়া পড়িবে।” ৩বিজয়াদশমীর পরদিন বাবাকে প্রণাম করিয়া কাশী হইতে রওনা হইয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পর আর বাবার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুর মহিমা ও লীলা-কথা

রায় সাহেব মোহিনীমোহন সান্যাল

তুমি গুরু, আমি শিষ্য,

আমারে দিয়াছ শিখায়ে কর্তব্যের মূল,

লভিতে পরমাত্মন এ পার্থিব জীবনে ।

আমার “আমিত্ত” বাহা তুমি তার মূল ;

আমি তব, তুমি মম, এই জানি স্থূল,

আমি কে, তা বুঝি এই,

তুমি ছাড়া আমি নেই,

আমি তব অণুকণা, তব পদধূল,

ও রাজ্য চরণ ঘেন থাকে হৃদে বন্ধমূল ।

হে দয়াল গুরো করুণা অবতার,

জীব লীলা অবসানে

তব প্রেম সিদ্ধুপানে

ছুটে যেন জীবন গঙ্গা করি কূল কূল ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুদ্বানন্দ কানন আশ্রম ও ঊনবমুণ্ডী সিদ্ধাসন ।
ভারতের শ্রেষ্ঠ তপোবন এই বিষ্ণুদ্ব কানন আশ্রম সাধনের
রাজপথ, মেরুদণ্ড । ঊনবমুণ্ডী সিদ্ধাসন ইহার বৈশিষ্ট্য
(যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীগুরুদেবের মহাযোগের নিদর্শন)
মহাশক্তি মহামায়ার মন্দিরে প্রবেশ দ্বার । অশেষ রত্নের
আকর ।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা চিন্তন, গুরুদত্ত ক্রিয়া, নামজপ, ৩নবমুণ্ডী সিদ্ধাসন, সবই এ সাধন রাজপথে অপরিহার্য। যতকিছু আছে এখানে ধ্বনিছে মধুর স্বরে শ্রীশ্রীগুরুর লীলার পাবন ওঙ্কার।

কিছুদূরে পূর্ণতময় কলুষ হর তরঙ্গা, কুলকুল নাদিনী মা গঙ্গা, দিক্ চক্রভালে রেখা টানিয়া সেই ধ্বনি দিগদিগন্তে বহন করিয়া নিয়া যাইতেছে।

তাইতো বহিছে মলয় পবন, ধিরিয়া এই বিশুদ্ধানন্দ কানন, শ্রীশ্রীগুরুদেবের অঙ্গ গন্ধ ছড়াইয়া।

আধ্যাত্মিক জীবন যাহাদের একান্ত কাম্য, চরণ লক্ষ্যে উপনীত হইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, এই কানন আশ্রমই উপযুক্ত তপোবন। প্রাণ ভরিয়া আধ্যাত্মিক সুধারস পান করিবার মহাতীর্থ সিদ্ধভূমি। এখানের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে হিংসা অহিংসা সাম্য, অদ্বৈতभाव।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা কাহিনী যতই প্রকাশ ও প্রচার হইবে, আমরা গুরুতাই, ভগিনী, ভক্ত সন্তান সকলেই তাঁহার দিব্য স্পর্শ নিবিড় ভাবে অধিক অনুভব করিব।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা মাধুরী নিত্য নূতন, আদিহীন, অন্তহীন, অফুরন্ত, অসীম, অনন্ত বিরাট। তাহা যতই স্মরণ করা যাইবে, চিত্তের নব নব ভাবান্তর হইতে থাকিবে।

তিনি দিতেছেন তাঁহার অপূর্ব করুণা বাণী । ত্রিতাপ
তাপিত তাঁহার সন্তানের উহাই পরম সান্ত্বনা । তাহার ভিতর
দিয়াই কৃপাময়ের ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে ।

তিনি অনন্ত ঐশ্বর্যশালী হইয়াও এখনও সন্তান বাৎসল্য
প্রেমে আপনাকে লুটাইয়া দিতেছেন । লীলা কাহিনী পাঠে
তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

পার্বতী মন্দির দর্শন ঘটনা

পুনা, ২৩শে এপ্রিল, ইং ১৯৫৯ সন । পুলিশের কার্যে
অবসর গ্রহণ করার কিছুদিন পরে আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি,
হৃদরোগে আক্রমণজনিত অবসাদ আসে । আমি কিছুদিনের
জগ্ন আমার তৃতীয় পুত্র ডাক্তার গিরীন্দ্রমোহন সাত্ত্বালের
বাড়ীতে পুনার স্বাস্থ্য পরিবর্তন করিতে যাই ।

আমি সকালে যখন প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আফ্রিক ঘর
হইতে বাহির হই তখন দেখি আমার ছয় সাত বৎসর বয়স্ক
নাতি (যাহাকে শ্রীশ্রীগুরুদেব জন্মের কিছুদিন পরেই মৃত্যু মুখ
হইতে বাঁচাইয়া পুনর্জীবন দেন) মাটি দিয়া “পার্বতী মন্দির”
তৈয়ারী করিতেছে । মাটি দিয়াই মহামায়ার মূর্তি তৈয়ারী
করিয়া পূজা করিতেছে ও যাহা কিছু ফলমূলদি প্রসাদ
আমাদের পাইতে বলিতেছে । একদিন আমার বড়ই কৌতূহল
হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, “হারে দাছ নারায়ণ, তুমি এই ভাবে
পূজা করিতে কোথায় শিখিলে ?” সে উত্তরে বলিল, “তুমি জান না

বুঝি, ঐ যে দাছ নারায়ণ (শ্রীশ্রীগুরুদেবের কটো দেখাইয়া) আমাকে বলেছে। ” “মন্ত্র কোথা পেলি ? ” উত্তরে বলিল, “সর্বভূতে সনাতনি নারায়ণি নমোহস্তুতে । ” আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম এইটুকু ছেলের ভক্তি দেখে । আমার তীব্র আকাজকা হচ্ছিল পার্বতী মন্দিরে “মা ভবানীকে ” দর্শন করিবার—কিছু সময় পরে সুযোগও আসিল । শরীর তখনও দুর্বল ।

২৩শে এপ্রিল বৈকালে নাতির সঙ্গে পার্বতী মন্দির দর্শন করিতে রওনা হইলাম । রাস্তায় গাড়ীটা খারাপ হওয়ায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে মন্দির প্রাঙ্গণে পৌছাই । অত্যাচ্চ “টিলার ” উপরে প্রায় ১৪০০।১৫০০ সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠিতে হয়, রাস্তায় মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিবার বন্দোবস্ত আছে । অনেকটা দূর উঠিতে উঠিতে আমার হৃৎকম্পন দেখা দিল । শরীর ক্লান্ত অবসন্ন—প্রতি মুহূর্তে হার্টফেল হবার আশঙ্কা । পথের বাম ধারে একটি সন্ন্যাসী বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন । তিনি আমাকে হিন্দিতে ডেকে পার্শ্বে বসিতে বলিলেন, বিশ্রামের জন্ত । সন্ধ্যা আগন্ত-প্রায় । চলিতে অক্ষম, কাজেই কাছে গিয়া বসিলাম ।

প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধহবি আর্দ্রসিক্ত বিশাল জটা, সৌম্যমূর্তি, বসেছেন বেষ্টন করি ছায়াতে । হাতে একটি ছোট ত্রিশূল, বড় চিমটা, একাধারে প্রজ্ঞা ও করুণার প্রতীক । হঠাৎ মনে হইল কে এই আনন্দঘন মহাপুরুষ ? স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ছিলাম । হিন্দী ভাষায় বলিলেন, “তুমি শ্রীশ্রীবিগ্গ্হানন্দ মহাযোগিরাজের চেলা, তোমাকে দেখিয়াই ঠাহর করেছি । নিজেই বলিলেন,

“আমি শ্রীশ্রীযোগিরাজের পুরাণে গুরুভাই, এখন মহারাষ্ট্র প্রদেশে এসেছি। তুমি বড়ই ক্লান্ত।” এই বলে আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তাঁহার হস্তস্পর্শে আমার অঙ্গ শীতল হইল, তড়িৎ বহে গেল, দেহ মন পুলকে ভরিল, শক্তি ফিরিল। আমি বিদায় নিয়ে উপরে উঠিতে লাগিলাম, অদম্য উৎসাহ।

সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। মন্দির দ্বার বন্ধ করে পূজারী আপন কুটীরে যাইতেছিল। অনুরোধ করায় দ্বার খুলিয়া দিল। মাকে দর্শন করিলাম। প্রসন্ন প্রশান্ত নিরঞ্জন আনন্দময় মূর্তি, মায়ের দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, অধরে করুণার সুধাহাস্ত। সন্ধ্যার শান্ত নিস্তব্ধতায় শ্রদ্ধানত চিত্তে প্রণাম করিলাম—এই ত বলিষ্ঠ আশ্রয়, অভয় প্রতিষ্ঠা—

“আধারভূতা জগতস্ত্রমেকা বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়্যা।”

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, মনের প্রতিকূল অবস্থা অনুকূলে চালিত, প্রফুল্ল বিশ্বাস ভরা আনন্দ মনে ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম। প্রতিক্ষণে মনে হইতেছিল “কে এই উন্নত উজ্জ্বল সন্ন্যাসী, ক্ষমা, স্নেহ, মাধুর্যের অনন্ত ভাণ্ডার?” আমি সেই বিরাট মহাপুরুষ শ্রীশ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্য পুনরায় লাভে আসন্ন মৃত্যুর হাত এড়াইলাম। আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জগৎ শাশ্বত প্রকাশের আলোক পুনরায় রূপায়িত হইল। যে স্থানে তাঁহাকে দর্শন পাইয়াছিলাম তিনি আর সেখানে নাই, অন্তর্দ্বান হয়ে গেছেন।

পুনায় শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুনরায় বিচিত্র লীলা প্রকাশ :—

নাতি কর্তৃক পায়সান্ন ভোগ

আমরা নিতা শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ফল দুধ মাঝে মাঝে পায়সান্ন ভোগ দিতাম । শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে আশ্রয় পাইবার কয়েক বৎসর পূর্বে জালামুখী তীরে প্রকট মহাপুরুষ সন্ন্যাসী আমাকে একটি শিবলিঙ্গ দেন । লিঙ্গটি “হরিহর এক তনু গৌরী অঙ্ক-অঙ্ক ।” সকলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বপত্রে পূজা করিতে বলেন । তখন আমার নিজ বাড়ীতে (সলপ, পাবনা, অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) মহাশক্তি মহামায়ার আরাধনা হইত । আমি মহাষ্টমী তিথিতে ঐ শিবলিঙ্গটির সচল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলাম । তদবধি সামান্য ভোগ ঐ একসঙ্গেই দিই । নির্দেশ মত পূজা চলিতেছে । প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম পূজার ঘরে নাতিটি যাইত ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের ও লিঙ্গটির সামনে বসিয়া থাকিত ।

১০ই জুন, ইং ১৯৫৯ সন, নাতি জেদ ধরিল সে নিজে শ্রীশ্রীগুরুদেবের ও শিব ঠাকুরের ভোগ দিবে । যথারীতি ব্যবস্থা করা হইল । নাতি নিজ হাতে ধূপধূনা দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল । তখন বেলা প্রায় ১১টা । কিছুক্ষণ পর বাহির হয়ে এসে, বাহির থেকে আবার দরজা বন্ধ করে দিল ও প্রহরীরূপে দরজার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল । আধ ঘণ্টা পরে দরজা খুলে আমাকে বলিল, “দাছ, শ্রীশ্রীগুরুদেব ও শিবঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেছে । তোমরা দেখ ।” সত্যই দেখিলাম

বাটি দুইটার স্থানে স্থানে পায়সানের কণিকা লেগে আছে। অশ্রুজলে আমরা সিক্ত হয়ে গেলাম। তখনকার অবস্থা বর্ণনাতিত। ভাষা নাই যাহাতে বুঝাইতে পারিব।

হে দয়াল মঙ্গলময় গুরো, বহুরূপধারী পূর্ণ সদাশিব মহেশ্বর, তোমার সেবার জন্য আজ নাতির আত্মপ্রাণে এই আয়োজনের উদ্দীপনা জেগেছিল। দীন হীন অবোধ বালকের সেবায় তুমি পরিতৃপ্ত হইও, এই আমাদের কামনা। হে দয়াল বিশ্বরূপধারী, লীলা কল্লিত অজ্ঞানতা ও আনন্দ হীনতার ভাণ পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানময় আনন্দময় মূর্তিতে আবার স্থূলদেহে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হও। দীন হীন সন্তানের সেবা সফল হউক। দীন সন্তান ধন্য হউক। আর যেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে মিথ্যা মোহজালে জড়িত হয়ে হতাশের উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে না হয়।

হে কল্পণাবতার, তুমি না একদিন এই দীন সন্তানকে উপদেশ বাণীতে বলিয়াছিলে, “দুঃখ আর ত্রিতাপ বলিয়া কিছুই নাই, নৈরাশ্র ও উৎপীড়ন বলিয়া সন্তানের কিছুই নাই। যাহা দেখিয়া তোমরা ভীত হইতেছ সবই তাঁহার লীলা। ক্রিয়াযোগে অন্তর্মুখী হইলেই মহামায়ার স্নেহসুত্বধারা। ক্রিয়া কর, কর্ম কর, অমৃতের সঞ্জীবনী ধারায় অভিষিক্ত হইবে। শান্তি পাইবে। মায়ের কোলে নিত্য অবস্থানের অধিকার পাইবে।” হে পরমগুরু, আজ আমাদের উপর তোমার সেই পরম মঙ্গলময় আশীর্বাদ বাণী বর্ষিত হউক। জীবন ধন্য করি।

ইং ১৯৫৯ সনের ২৯শে জুন শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশ হইল গুরুধামে শ্রীশ্রীবিগ্গদানন্দ কাননে সতীক গমন করিতে ও সাধনার জটিল সমস্যার গ্রন্থিভেদের সুযোগ পাইতে ।

শীতল করিল মোদের উদ্বেগ অনল ।

আদেশে আসিলাম শ্রীশ্রীবিগ্গদানন্দ কাননে (আশ্রমে) ।

“বাসনা মোদের হেরিব পরম পদ অনাদি কারণে

সর্বময় সর্বাশ্রয় পতিত পাবনে ॥”

সন্তান সন্ততির প্রতি অসীম করুণা

ইং ১৯৫৯ সনের ১লা নভেম্বর আমার মধ্যম পুত্র সূদর ভিজাগাপট্টমে ফৌজদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ে । পুলিশ হাজতে তাঁহার আত্মকরণ ক্রন্দন আমার স্ত্রী মহানিশায় জপ করা কালে (প্রথম আমরা গণেশমহল্লায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিলাম) শুনিতে পায় । তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য আসিতেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের বাণী শুনিল, “প্রত্যেক শিষ্যের গৃহই আমার আশ্রম, প্রত্যেক শিষ্যা ও শিষ্যের সন্তান আমারই সন্তান সন্ততি, গৃহ-পরিজনই আমার আত্মীয়-স্বজন ।” তুমি মাসাবধি একটি করে কুমারী মাতার ভোগ দিবে । পরে পূর্ণ অভিষেক করিও, কোন বিপদ হবে না তোমার পুত্রের ।”

আমি পরের দিনই পরম শ্রদ্ধেয় গুরুতাই শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদার কাছে সব ঘটনা বলিলাম । তিনি পূর্ণ অভিষেক ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন । এক মাস নিত্য কুমারী ভোগ শেষে সতেরটি

কুমারী ভোগ দেওয়া হইল। শেষ দিন নিত্য কুমারীকে লাল পেড়ে কাপড়, শাঁখা, সিঁদুর, তেল ও আলতায় ভূষিত করে ভোগ হইল।

দুই তিনদিন পর মহানিশায় আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীগুরুদেবের বাণী শুনিতে পাইলেন—“তোমার ছেলে নির্দোষ ভাবে খালাস পেয়েছে, চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।” প্রকৃত পক্ষে ঘটিল তাহাই। ছয় সাতদিন পরেই আমার পুত্রের পত্র আসিল। সে বেকসুর খালাস পেয়েছে এবং দুর্গাপুরে ভাল চাকুরী পাইয়াছে।

আমার পুত্র এখন শ্রীশ্রীগুরুদেবের একান্ত ভক্ত। শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রত্যহই ধূপধূনা দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। ইচ্ছা তার প্রবল শ্রীশ্রীচরণের আশ্রয় পেতে। সময় সাপেক্ষ।

স্থূলদেহে শ্রীশ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব ও আমার কনিষ্ঠা কন্যার রোগমুক্তি ঘটনা ২২শে এপ্রিল ১৯৬২ সন।

আমার কনিষ্ঠা কন্যা গায়ত্রী দেবী শ্রীশ্রীগুরুদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। (শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্থূলদেহ থাকার সময় কুণ্ডুরোড আশ্রমে আমাদের সঙ্গে উহাকে দেখিয়া খুবই স্নেহ করিয়াছিলেন)

১৯৬২ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে গায়ত্রী গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তার টি. বি. বলিয়া স্থির করে। দেৱাছন হাঁসপাতালের একটি কক্ষে উহাকে আলাদা করে

ডাক্তার রেখেছিল। সমস্ত দিন রাত্রি আকুল ক্রন্দনে, অনিদ্রায়, অনাহারে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ডাকিতে থাকে।

২২শে এপ্রিল প্রভাত সময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেব ও আর একটি নাতিদীর্ঘ আয়তলোচন, লম্বা জটাভূটধারী বর্ষীয়ান্ মহাপুরুষ উহার কক্ষে আবির্ভূত হন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এত কাঁদছ কেন?” গায়ত্রী বলিল, “দাছ, আমার টি. বি. হয়েছে, বড়ই যন্ত্রণা, একাকী ঘরে রেখেছে।” শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিলেন, “দূরো পাগলী মেয়ে, কিছুই হয় নাই তোরে। ধর, ঔষধ নে।” ঔষধ দুইটি বড়ির মত, হাতে দিলেন ও খাইতে বলিলেন। পলকেই উহারা অন্তর্দ্বান হয়ে গেলেন। ঔষধ খেয়ে সে এখন সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের অসাধারণ কৃপা ও মধুর বাৎসল্য। গায়ত্রী পরে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর চরণে স্থান পেয়েছে। মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীগুরুদেবের করুণাও পাইতেছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সমাধিভূমি—মহানিশা।

শ্যাম ছর্ব্বাদলে ছেয়ে আছে ক্ষুদ্র নিরলঙ্কার সমাধিভূমি। নিশ্চল নীলাকাশ থেকে প্রত্যহ নিশীথে সঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির। প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ অরুণের প্রথম কিরণরেখা, সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোখুলির আলোকের সোনালী ছায়া, তারা পেয়ে সেই শ্রীঅঙ্গের ললিত সুবাস হারিয়ে ফেলে নিজকে তখন। কি সুন্দর মনোহর। অদূরে শবদাহ হইতেছিল—

আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করে জপ করিতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের গুরু গম্ভীর স্বরে বাণী শুনিতে পাইলাম—“সমাধি স্থানে এসেছ, ভালই। মোহিনী, শুন গো—জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, ভেদও নাই, অভেদও নাই। যে নিত্য লীলা লোক থেকে অনিত্য জগতে অবতরণ করেছিলাম, আবার সেই স্থানেই গমন করেছি। তোমার মনে হয় আসা যাওয়া—তুইই রহস্য। জীবের মত জন্ম-মৃত্যুর অধীন না।

“শুনো, জেনে রেখো—যে দেহ নিয়ে প্রকট হয়েছিলাম সেই চৈতন্যদেহ দেহ নিয়ে এসেছি। অবতরণ জীব শিক্ষার্থ। লীলার উদ্দেশ্য মানব জগতে সাধন রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব সূদৃঢ় করে মহাধর্ম সংস্থাপন করা। সেটা হচ্ছে সেবা ও কর্ম—ভক্তির্ম জীবের পরমধর্ম। এই মহাধর্মের প্রতিষ্ঠান বিশ্ব জগতে জীব কল্যাণে। অধ্যাত্ম রহস্যবিৎ ঋষি গোপীনাথের কাছে সব জেনে নিও।

“শুনো আরও, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস ধর্ম দুইটির মধ্যে প্রবল বেগে নদী বাহির করে দিয়াছি (বুঝা গেল না কোলাহল শব্দদাহের শব্দে.....)

“সংসারী সন্তান কতককে নির্জন জায়গায় এসে জীবনের হিসাব নিকাশ মিলাতে সুযোগ দিয়াছি।

“জেনো, এরা জীবন যাত্রায় সংসারের কর্মবন্ধনে ভীত হয়ে

আশ্রয় চেয়েছিল। আশ্রয় দিয়াছি, জেনো উহারা কাপুরুষ।
উহারা মায়ের কোলে নিত্য লীলা দর্শন প্রার্থী নয়। তবুও
শান্তি যদি পায়।

“জুনো, জীবনে সংসার বন্ধনের শক্তগ্রস্থি কাটাও, গ্রস্থি
কাটাইয়া সীমায় দাঁড়াও। সীমা থেকে অসীমাতে পা বাড়াও,
তবে ত পূর্ণত্বের দিকে যাবে। শূন্য যেটা মনে করছ, শূন্য না—
সেইটাই সীমা।

“কাঁদছ কেন? আমি ত তোমার পিছনে সর্বদাই আছি।
সময় আসিলেই চাবিকাটি দিয়া দিব। কৰ্ম কর, নিয়ত কৰ্ম
কর, নিত্য নিত্য আনন্দ পাবে। আর কেঁদো না।”

প্রঃ—বাবা, অসীমা কি চিরদিনই আমার মত দীন সন্তানের
বাহিরে থেকে যাবে? একবার কাছে দাঁড়াও না, পথ চেয়ে
এসেছি।

উঃ—আমার দৃষ্টি প্রসাদে আর ত তোমাকে বঞ্চিত করি
নাই। (বাণী মিলাইয়া গেল.....)

আজ এই বাণী উপদেশ আমার হৃদয় মরুভূমিতে আনন্দের
কালিন্দী। মধুবাতে ঋতায়ন্তে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ। নিরবচ্ছিন্ন
মুক্ত আকাশ তলে নবোদিত সূর্য্যের মত কত সুন্দর জ্যোতির্ময়
আনন্দ-ধামের সঙ্কেত। এই বিগুহবাণী মহানিশায়
শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপ্রসূতা আধ্যাত্মিক গঙ্গায় আজ অবগাহন
স্নান করে অপরিমেয় প্রাণশক্তি পাইলাম।

শ্রীশ্রীগুরুদেব সন্তানের ভব ভয় দূর করিয়া মধুকরের আয়
জ্ঞান বিজ্ঞানের সার পদার্থ অমৃতের আয় এখনও নিজ সন্তান,
ভক্তদিগকে পান করাইতেছেন। সেই পরম পুরুষ নব নব
লীলা রূপধারী শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

সর্ব সাক্ষী তুমি দেব ওহে অন্তর্যামী,
অন্তর বাহিরে দুই নিত্য দেখ তুমি,
জাগ্রত তোমার দৃষ্টি চালক বিহীন।
কিবা নিবেদন মোরা জানাবো তোমায়,
মুখের যে ভাষা মোদের সেও তব দান।
দয়ার সাগর দেব তোমারি দয়ার
বিগ্ধ কাননে আজি লভেছি আশ্রয়।
অপূর্ণ বাসনা মোদের হইবে পূরণ—
সাধন তত্ত্ব গুরুতত্ত্ব হৃদে প্রকটন।

এই পর্য্যন্ত এবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা কাহিনী বাহা কিছু
শ্রীশ্রীগুরুর কুপায় অনুভব করিয়াছি তাহার আংশিক শেষ
করিলাম। হে পরমানন্দময় শ্রীগুরো তোমার লীলার কি বুঝি,
কতটুকু বা জানি। হে দয়াময় শ্রীশ্রীগুরুদেব, ক্রটি বিচুতি
হইতে পারে তার জন্ম বিনীত ভাবে ঐ রাতুল চরণে ক্ষমা
প্রার্থনা করিতেছি। অপরাধ মার্জ্জনীয়।

অঘটন আজও ঘটে

শ্রীবিভাবতী রায়

অঘটন আজও ঘটে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার জীবনে কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা আমার এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে দুইটির সম্বন্ধে আমি লিখিতেছি।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে ইং ১৯৫৭ সালের মে মাসে। সংসারের দারুণ অশান্তিতে অস্থির হয়ে আমি স্বামী, সন্তান ছেড়ে গুরুর আশ্রমে চলিয়া যাইব স্থির করিলাম। কিন্তু আমার মার কাছে যখন এই কথা বলিলাম তখন আমার মা আপত্তি করিলেন। আমি পীড়াপীড়ি করায় তিনি বলিলেন, “বড় উতলা হয়েছো, তোমায় আট দশ দিনের জন্য যাইতে অনুমতি দিলাম।” আমি গুরু ভরসা করে কাশীতে একলা চলিয়া এলাম। আসিয়া আশ্রমে যাইয়া শুনিলাম কোন শিষ্যা এখন সেখানে নাই, কাশীতে ভীষণ কলেরা হইতেছে এবং অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। কোন খাবারের দোকান খোলা নাই। আশ্রমে যাহারা ছিলেন তাঁহারা বলিলেন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ দাদার অনুমতি লইয়া আসিবেন।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ দাদা আমার গুরুভাই। তাঁহার

কাছে চলিয়া গেলাম। সেই দিন বৃহস্পতিবার ছিল, তিনি ঐ দিন মৌনী থাকিতেন। তিনি একটি কাগজে লিখিয়া দিলেন, “আপনি কাল সকালে সাড়ে সাতটায় দেখা করুন।” আমি ফিরিয়া আবার বাবার বাড়ীতে নামিলাম।

তাহার পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় তাঁহার কাছে যাইলাম। তিনি আমায় বলিলেন, “কোন স্ত্রীলোক নাই, আপনি একা থাকিবেন, আপনার পক্ষে অসুবিধা হইবে।” তাঁহাকে আমার মনের অবস্থা জানাইলাম। তাহা শুনিয়া তিনি সাত দিনের জন্য থাকার অনুমতি দিলেন এবং আমার হাতে আশ্রমের উদ্দেশ্যে এই মর্মে একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন যে এই ভগিনী মনের বেদনায় এসেছেন, এঁর থাকিবার ব্যবস্থা ভাল করিয়া ঘেন করে, গেষ্ঠ হাউসে বড় ঘরখানি পরিষ্কার যেন করে এবং আশ্রমের চাকর কিম্বা ঠাকুর ঐ বাড়ীর উঠানে যেন রাত্রে শোয়। আমি সেই পত্র লইয়া শুক্রবার দিন আশ্রমে আসিলাম। এখানে শুক্রবার ও শনিবার দিন থাকার পর ওখানে যে গুরু-ভায়েরা ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, “আপনি কেন মা এসেছেন, এখানে থাকায় আপনার কষ্ট হচ্ছে, চারিদিকে এত কলেরা হচ্ছে। আশ্রমে আপনি একা মহিলা, আপনার কিছু হলে বিপদে পড়িবেন।” আশ্রমে প্রত্যেক দিন একটি করিয়া কুমারী ভোজন করিত, শুনলাম কুমারীর অসুখ করিয়াছে। এইরূপ প্রায়ই ঘটতেছে। আবার অন্য একটি কুমারী খুঁজে আনা হইবে। এই সব জানিয়া আমি একবার ভাবিলাম চলে আসিব। তার

পরই মনে হইল যা হয় হউক, গুরুর কাছে এসেছি, তিনি দেখিবেন। রবিবার দিন রহিলাম, কিন্তু রাত্রে হঠাৎ আমায় কে যেন ঘুমন্ত অবস্থায় চাবুক মারিয়া বলিল, “তুই বাড়ী চলে যা, এখানে থাকায় বিপদ আছে, বার বার মনে করাইয়া দিতেছি, চলে যা, চলে যা।”

আমি সোমবার দিন সকালে স্থির করিলাম চলে আসিব। পূজা শেষ করিয়া প্রসাদ খাইলাম এবং আমার গুরুতাই কিছু প্রসাদ সঙ্গে দিলেন। আমি স্থির করিলাম আমার বাবার বাড়ীতে হনুমান ঘাটে আসিব। জিনিষ বিশেষ সঙ্গে ছিল না, যাহা ছিল তাহা লইয়া একখানি রিক্সা করিয়া গুরু নাম স্মরণ করিয়া রওনা হইলাম, পথে আসিতে আসিতে এক ঘটনা ঘটিল। রিক্সাটা আসছিল। হঠাৎ একটি গলি হইতে তিনটি গাধা উর্দ্ধ-স্থানে ছুটিয়া আসিয়া রিক্সায় ধাক্কা দিল। রিক্সা চালকের ভীষণ আঘাত লাগিল, সে পড়িয়া গেল। আমি ছিটকে বোধ হয় বিশ হাত দূরে পড়িলাম। যখন ধাক্কা লাগিল তখন আমি ক্ষণিকের জন্য জ্ঞানশূন্য, মনে হইল এবার গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, প্রায় পঞ্চাশ জন লোক ছুটিয়া আসিল। যখন আমার ধরে তুলিল তখন আমার কোনও অঙ্গে একটু লাগে নাই, পায়ের গোড়ালিটার সামান্য একটু ব্যথা মনে হইল। চশমাখানি ছিটকাইয়া কোথায় পড়ে গিয়াছে। একজন লোক চশমাটি প্রায় পঁচিশ হাত দূরে ফুটপাথ থেকে কুড়াইয়া আনিল, তাহাতে এতটুকু খুঁত হয় নাই। রিক্সার একটি চাকা বেঁকে গিয়াছিল

এবং কতকগুলি চাকার লোহা ভেঙ্গে গেছিল। রিক্সা চালকের পায়ে ভীষণ লেগেছিল, হাঁটিতে পারিতেছিল না। প্রসাদগুলি ঠিক মাটির ভাঁড়ে ছিল, একটুও মাটিতে পড়ে নাই। আমি তখন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম, ইহা সব গুরুর কৃপা ছাড়া আর কি হইতে পারে। রিক্সা চালক খুব ভাল ব্যবহার করিল। সে যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমায় আর একটি রিক্সা চালককে ডেকে বলে দিল, মাইজীকে ভাল করে নিয়ে ধাও এবং এই ভাড়া ঠিক হয়েছে। তাহার এইরূপ ব্যবহারে আমার মন ভরে গেল। তাহার সততার জন্য আমি তাহাকে চার গুণ ভাড়া দিয়ে বলিলাম তোমার যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহার কিছুই দিতে পারিলাম না। ‘সবই গুরুকৃপা’ এই বিশ্বাস মানুষকে করিতেই হইবে। আমি তখন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব স্থির করিলাম এবং চলিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে। ঘটনা ত অনেক ঘটে, কত আর লেখা যায়, তবে এইটি খুব আশ্চর্য্যজনক ঘটনা।

আমার দাদা কানাইলাল ঢোল বরাহনগর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাহার হঠাৎ “করোনারি এট্যাক্” করে বেলা বারটায়। আমার ছোট ভাই বলাই বাড়ী হইতে দশ মিনিট পূর্বে রওনা হইয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অফিস। বাড়ী হইতে অফিসে ফোন করা হইল শীঘ্র চলিয়া আসিতে। কর্মচারী ফোন ধরিয়াছিল, ছোট ভাই তখনও

অফিসে পৌঁছিতে পারে নাই। সে অফিসে উপস্থিত হইলে তখনই তাহাকে কর্মচারী বলিল, “শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া যান, এই খবর আসিয়াছে।” সে আশ্চর্য্য হইল এবং নিজে বাড়ীতে ফোন করিয়া জানিল দাদার খুব খারাপ অবস্থা। সে তখনই শ্যামবাজারে একজন বড় ডাক্তারের কাছে গেল। তাঁহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিল সম্ভব এক জ্বীলোককে খুব কীৰ্ত্তন করিয়া ফুল দিয়া লইয়া যাইতেছে। আমার ছোট ভাইয়ের বোধ হইল যেন সেই মৃত দেহের মাথার কাছে গুরুদেব বসিয়া আছেন। তাঁহার এই আবির্ভাবে সে চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণে সেই মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। জ্বীলোকটি কে বা কোথায় থাকিতেন আমরা তাহা জানিতাম না। আমার মনে হয় নিশ্চয় তিনি গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন কিংবা ভক্ত। ডাক্তারকে লইয়া বাড়ীতে ঢুকিতে গিয়া আমার ছোট ভাই আমার বাবাকে বাড়ীর সামনে দেখিতে পাইল। বাবা চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে দেহ রাখিয়াছেন। বাবা যে পোষাকে থাকিতেন ঠিক সেই পোষাকে দাঁড়াইয়া আছেন। ছোট ভাই কেমন যেন দিশাহারা হইয়া ভাবিতেছিল, একি দর্শন করিতেছি! তবে বোধ হয় শুভচিহ্ন। বাবা ও মা গুরুদেবের দীক্ষিত ছিলেন। সত্যই গুরুদেব ও আমার বাবা আমাদের বিপদ দেখে আশীষ দিয়ে গেলেন। আমার দাদার যে ভাবে “করোনারি এট্যাক্” করেছিল কোন লোক এভাবে বাঁচে না। ডাক্তারেরাও আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সেই “এট্যাকে”র পর চার বৎসর হইল, তিনি এখন ভাল আছেন, তবে কোন পরিশ্রম করিতে পারেন না এবং করিলে শরীর খারাপ

হইয়া পড়ে। এখন তিনি নীচে নামিতে পারেন না ও কোন বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে শরীরের কষ্ট আরম্ভ হয়। যাহা হউক, আমরা বলিব ও বিশ্বাস করিব এই সব ঘটনা গুরুকৃপা ছাড়া আর কিছু নহে। এখনও দাদা যে বাঁচিয়া আছেন তাহা গুরু-কৃপায়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিলে আমরা সর্বদাই তাঁহার কৃপা দর্শন করিতে পারি। আমরা কিন্তু বাহিরের জগতে এত লিপ্ত যে এই সব ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। একটু মন দিয়া স্থির চিন্তে চিন্তা করিলে আমরা গুরুকৃপা লাভ করিতে পারি।

শ্রীগুরু-স্মৃতি ও কয়েকটি কথা

শ্রীষতীশচন্দ্র বসু

আশ্রমস্থ বিগ্রহাদির সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্বে “বিশুদ্ধানন্দ কানন” আশ্রমের প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত যতদূর সম্ভব সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, সেই বিষয়ে যতদূর মনে পড়ে লিখিতেছি। অশিষ্য ধর্মপ্রাণ বহু ব্যক্তির সমাগম ক্রমেই বাড়িতেছে। তাঁহাদের এই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নাই। এমন কি শ্রীগুরুদেবের শেষের দিকের দীক্ষিত বহু শিষ্যের ও প্রাচীন শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা আশ্রম নির্মাণ বিষয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তাঁহাদেরও এই আশ্রমের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা নাই, ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহা বহু পূর্বের ঘটনা। লিপিবদ্ধ কিছু না থাকাতে কেবল মাত্র স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া যাহা লেখা হইতেছে তাহাতে কিছু কিছু ভুল ক্রটি থাকা অসম্ভব নহে। সেইজন্য সকল প্রাচীন গুরুভ্রাতাকেই প্রয়োজন মত ইহা সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

“বিশুদ্ধানন্দ কাননের” অনুরূপ একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা বোধ হয় প্রথমে শিষ্যদের মনে অনুমান ১৯২০ সালে বা তাহার কিছু পূর্বে জাগিয়াছিল। শ্রীগুরুদেব তখন জগদীশ বাবু বা প্রবোধ বাবুর ধানবাদ কি বরাকরের বাসায় ছিলেন।

সেই সময় একদিন বৈকাল হইতেই উপস্থিত শিষ্যরা, ষাঁহাদের মধ্যে আমার বাবা ও শ্রীশুরেন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন, শ্রীগুরুদেবের বিমর্শ ও অন্তমনস্ক ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় কোন কথাই বলিতেছিলেন না। হতাশাসূচক ভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন “কেনই বা আসিলাম, কোন উদ্দেশ্যই সাধন করিতে পারিতেছি না, থাকিবার প্রয়োজনই বা কি।” এই ভাবের কথা শুনিতে শুনিতে সুরেনবাবু কাতর হইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে যাইলে অপর সকলে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীগুরুদেব মুখ ধুইতে ধুইতে বলিলেন, “যদি কাশীতে এক বাগানের মধ্যে ভাস্করানন্দ সরস্বতীর ত্রায় আমার মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সমগ্র শিষ্য মণ্ডলীর অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে।” সেই কথা হইতে এইরূপ একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা শিষ্যদের মনে উদ্ভূত হইয়াছিল।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। এই আশ্রম কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়িয়া উঠে নাই। ঘটনা স্রোতে ও শ্রীগুরুদেবের শনৈঃ শনৈঃ ইচ্ছার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়া ইহা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল এবং তৎপরে গত এগার বার বৎসরের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চেষ্টা ও পরিশ্রমে ইহা এখন এক রমণীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার প্রায় দুই তিন বৎসর পূর্ব্বই কালী দিদির মারাত্মক টাইফয়েড ব্যাধি হইতে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রক্ষা করায়, শ্রীগুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে সতীশ

বাবু দিলীপগঞ্জ মহল্লার ছইটি বাটী ক্রয় করিয়া একটি নিজের বাসের জন্য রাখিয়া সম্মুখস্থ অপরটিতে শ্রীগুরুদেবের বাসের ব্যবস্থা করেন। ঐ বাড়ী “বিশুদ্বানন্দ কুটীর” নামে অভিহিত হইয়া কয়েক বৎসর যাবৎ কাশী আশ্রম বলিয়া শিষ্য মণ্ডলীর নিকট খ্যাত ছিল। অনেক শিষ্যই কিন্তু তখন হইতেই ঐ মহল্লাকে আশ্রমোপযোগী স্থান মনে করিতেন না।

বোধ হয় ১৯২১ সালে সতীশবাবুর এক চাকরের হঠকারিতার ফলে একদিন সকালে যোগযুক্ত অবস্থায় থাকা-কালীন গুরুদেব অঙ্গে আঘাত পান এবং তাহাতে উপস্থিত শিষ্যবৃন্দ ও স্থানীয় শিষ্যগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্থির করেন যে সম্ভব আশ্রম উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার একদিনের মধ্যে ১৪০০।১৫০০ টাকা সংগ্রহ করেন।

পূর্বোল্লিখিত বাগানের কথা অনেক শিষ্যের মনে ছিল এবং সেই দিকেই প্রথমেই তাঁহাদের চেষ্টা চলিতে লাগিল। রাধিকা বাপুলী, ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভিক্ষুরাম ঘোষাল মহাশয়দের ও কাশীবাসী অন্যান্য শিষ্যদের যত্ন এবং পরিশ্রম অবশ্য স্বরণীয়। ক্রমে মুন্সী মাধোলালের নিকট হইতে এই জমী সংগৃহীত হইল—ইহা তখন এক বিধবাশ্রম রূপে ব্যবহৃত হইত। অধুনা পূজারীদের ব্যবহৃত এক সারি ঘর, তাহার সম্মুখস্থিত করগেট বোড়ের টানা বারান্দা এবং মহিলা মহলের কয়েকটি ঘর ভিন্ন গৃহ বলিতে তখন আর কিছু ছিল না। পাতকুয়া

একটি ছিল এবং তাহার পার্শ্বস্থ ছোট দরজাটি একমাত্র প্রবেশ পথ ছিল। বাগানের জমি সদর রাস্তা হইতে নীচু থাকায় জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। পাতকুয়ার ধারে একটি ডোবা ছিল ও তাহার অপর দিকে কিছুদূরে দ্বিতীয় আর একটি ডোবা ছিল। Electric ছিল না। মধ্যে একটি কল—চৌবাচ্চা ছিল এবং আর একটি কল পশ্চিম প্রান্ত সংলগ্ন পায়খানা সারির ধারে ছিল। বাগান কেনা হইবার পরও প্রায় তিন বৎসর হনুমান ঘাটের বাটীতেই আশ্রম ছিল। বাগানে যে ঘরগুলি ছিল তাহাতে শ্রীগুরুদেবের বাস বা আশ্রমরূপে ব্যবহার উহাদের আমূল পরিবর্তন ও মেরামত ভিন্ন সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ শ্রীগুরুদেবের জন্ম নূতন গৃহ নির্মাণ আবশ্যক ছিল। চারিত্র্য বিজ্ঞান মন্দিরের জায়গায় শ্রীগুরুদেবের বাসোপযোগী দ্বিতল গৃহ নির্মাণের কথা ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে বিধুবাবু ৫০০০০ হাজার টাকা নগদ ও দ্রব্যাদি বাবদ প্রায় আরও ৬০০০০ টাকা দিয়াছিলেন। দেশ বিদেশের দূর দূরান্তরের বহু শিষ্য এককালীন বা মাসিক বহু টাকা দান করিয়াছিলেন। সমস্ত আশ্রম জমি মায় বাড়ী শিষ্যদের প্রদত্ত অর্থে নির্মিত হইয়াছে, কেবল রাজরাজেশ্বরী ভবন ছাড়া। টাঁদার টাকা সব সময় সমান ভাবে পাওয়া যাইত না, সেইজন্য সব কাজ সমাধা হইতে সময় লাগিয়াছিল—বিশেষতঃ শ্রীগুরুদেব টাকা বাকী রাখিয়া কোন কাজ করানর ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। জ্ঞানগঞ্জের আদেশে শিষ্যদিগের নিকট হইতে আশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে কোনও অর্থ সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

১৯২২ সালে বাগান কিনিয়া গৃহাদির সংস্কারের পর তহবিলে টাকা কমিয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে নৃপেন্দ্রনাথ বসু ৪০০০/- টাকা দিয়া গোপাল মন্দির নামে কথিত দুইটি পাকা ঘর ১৯২৫ সালে নির্মাণ করাইয়া দেন। একটির মেঝেতে মার্বেল দেওয়া হইয়াছিল, সেইটিতে ৩গোপালের পাদপদ্ম স্থাপিত হইবার কথা ছিল। স্থির হইয়াছিল পাশের ঘরটি গুরুদেবের আফ্রিক ও গুইবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হইবে যতদিন না পরিকল্পিত দ্বিতল বাটী নির্মিত হয় এবং পরে ঐ ঘরে শ্রীগুরুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারিবে। ১৯৩২ সালে মূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় অপরের ব্যবহৃত ঘরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে জ্ঞানগঞ্জ হইতে আপত্তি আসায় বিশুদ্ধ ভাবে অধুনাতন মন্দির কুঞ্জবাবুর তত্ত্বাবধানে তৈয়ারী হয়। ঐ সময় তাঁহার ভোগ হইত মহিলা মহলের ভিতর দিককার একটি ছোট ঘরে, ছুপুরে তিনি বিশ্রাম করিতেন প্রায় করগেট বারান্দার নীচে, বৈকালে শিষ্য ও ভক্তরা আসিলে বসিতেন গোপাল মন্দিরের পিছনের চওড়া রকে। যখন হইতে শিষ্যরা নূতন আশ্রম স্থাপনে উद्यোগী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন তখন হইতেই শ্রীগুরুদেবের আগ্রহও বাড়িতে লাগিল। সেটা ছিল একটা দেদীপ্যমান উৎসাহ ভক্তি ও নির্ভার যুগ। শ্রীগুরুদেবের স্বাস্থ্যও তখন ভাল ছিল এবং তিনি শিষ্যদিগকে সব সময়ে নানা প্রকারে উপদেশ দিয়া ঠিক পথে এবং তাঁহার মনোমত ভাবে যাহাতে তাহার চালিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। বিশেষতঃ তখন তিনি সূর্য্য-বিজ্ঞান লইয়া খুবই পরিশ্রম করিতেন এবং উহার ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও

প্রচার (অবশ্য শিষ্যদের মধ্যে) সম্বন্ধে উদ্যোগী ও আগ্রহশীল ছিলেন ।

যাহা হউক গোপাল মন্দির নির্মাণের পরই শ্রীগুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ কুটার ছাড়িয়া পূর্বোক্ত অশ্রুবিধা সম্বন্ধে “বিশুদ্ধানন্দ কানন” আশ্রম নাম দিয়া ঐ বাগানে আশ্রম স্থাপন করিলেন । টাকাও উঠিতে লাগিল এবং দ্বিতল গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থাও চলিতে লাগিল । এইরূপ সময়ে গুরুদেব একদিন প্রকাশ করিলেন যে কাশী শিব স্থাপনায় অশেষ পুণ্য এবং তাহার অনেক শিষ্যই আশ্রমে শিব স্থাপনা করিতে বাগ্র । অত্যাশ্রয় গৃহাদি নির্মাণ উপলক্ষ্যে সময় অতিবাহিত হইবে এবং তাহার পরে শিব মন্দির নির্মাণ করিতে আরও সময় লাগিবে । ইতিমধ্যে যাহাদের কাল পূর্ণ হইবে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না । অতএব দ্বিতল গৃহ নির্মাণ আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া আগে শিব মন্দিরের কাজে যেন হাত দেওয়া হয় ! তিনি নিজেই শিব ঘরের সমস্ত প্ল্যান মায় কত লম্বা, কত চওড়া হইবে, কোথায় গোঁরীপট্ট বসিবে এবং একই গোঁরীপট্টে সব শিব সমান ভাবে ও অধিকারে স্থাপিত হইবে এইরূপ নির্দেশ দিলেন । ১৯২৫ সালের মধ্যে শিব মন্দিরও নির্মিত হইল এবং আশ্বিন মাসে প্রথম দফায় শ্রীশ্রীঅখিলেশ্বরের সহিত শিষ্যদের আরও আট নয়টি শিব স্থাপিত হইল । ১৯২৬ সালে তিনটি ও ১৯২৭ সালে আরও দুইটি শিব স্থাপিত হইলেন ।

১৯২৭ সালে আশ্রমে প্রথম মন্ময়ী প্রতিমা মূর্তিতে দুর্গাপূজা

হয়। তখনও শ্রীগুরুদেব গোপাল মন্দিরের ঘরেই আছেন। ১৯২৮ সালে ভোগের ঘর তৈয়ারী হইল এবং সেই সময় তিনি বিজ্ঞান মন্দিরে উঠিয়া আসিলেন। গোপাল মন্দিরের ঘর দুইটি কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল শিষ্যদের থাকিবার স্থানাভাব বশতঃ তাহা না হইয়া শিষ্যগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইতে থাকিল। কুঞ্জবাবু আশ্রমবাসী হইয়া থাকিবার ইচ্ছা করাতে দ্বিতলের একটি ঘরে তাহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং আড়াই তলার সিঁড়ি হইতে একটি ছোট দরজার ভিতর দিয়া ঐ ঘরে বাহির হইতে আসিবার জন্য ঘরের ভিতরে এক কাঠের সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হয়। সনত যে ঘরে থাকিত সেই ঘরে দুর্গাকান্তবাবু থাকিতেন। ননীবাবু থাকিতেন অফিস ঘরে এবং এক কৃত্তী হিন্দুস্থানী ছাত্র, নাম গণপতিলাল ওঝা, থাকিতেন চারিতলার উপর সিঁড়ির ঘরে।

পাথর বাঁধান ঘরে যে glass case টি অব্যবহৃত হইয়া বহুকাল পড়িয়াছিল তাহার ভিতর পাদপদ্ম স্থাপিত হইবে এইরূপ কথা ছিল। ঐটি আমার খুল্লতাতে ভ্রাতা অরুণচন্দ্র বসু শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছানুক্রমে তৈয়ারী করান। খুবই সুখের বিষয় যে পাদপদ্ম এখন তাহার ভিতর রক্ষিত হইয়া শিব মন্দিরে আছে। গোপালজীউর রূপার সিংহাসনও অরুণ তৈয়ারী করায় এবং রৌপ্য নিৰ্ম্মিত খড়ম জোড়া বিশ্বেশ্বর দত্ত গড়াইয়া দিয়াছিলেন।

যেদিন পূজ্যপাদ জ্যোষ্ঠাগুরুদেব স্বর্ণ নিৰ্ম্মিত বিষ্ণুপত্র দিয়া শিবপূজা করিয়া গিয়াছিলেন তখন তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন

যে তাঁহার আসনের কোনও ব্যবস্থা মন্দিরে করা হয় নাই। সেই উদ্দেশ্যে এক বড় মার্বেল পাথরের চৌকী তৈয়ারী করাইয়া ও বড় গালিচার আসন দ্বারা আবৃত করিয়া কলিকাতা হইতে কাশীতে লইয়া যাওয়া হয়। কাশীতে ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামাইতে কিরূপ ভাবে আঘাত পাইয়া চৌকীর পাথরটি ফাটিয়া যায়। তৎসম্বন্ধেও শ্রীগুরুদেব উহা শিব মন্দিরে রাখাইয়াছিলেন। এই ঘটনা বোধ হয় ১৯২৫ সালের ৩জগদ্ধাত্রী পূজার সময়কার। আশ্রমের বড় লোহার গেটটি ১৯২৬। ১৯২৭ সালে রায় সাহেব ননীলাল মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে বসান হইলেও উহা সচরাচর বন্ধ রাখা হইত। আগেকার ছোট খিড়কীর দরজা দিয়াই আশ্রমে যাতায়াত চলিত।

১৯২৮ সালে পূজার সময় দুর্গাদেবীর ধাতুমূর্তি গৌরীপট্টের ডান দিকে স্থাপিত হয় এবং সেই বৎসরই গোপালজীউও বাম দিকে স্থাপিত হইলেন। পাদপদ্মও শিব ঘরে রক্ষিত জ্যোষ্ঠাগুরুদেবের আসনের উপর রাখা হইল। অনেক শিশুই অনেক গহনা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে সোনার পাতে বসান একটি সূর্য্য-বিজ্ঞানে নিৰ্ম্মিত হীরকখণ্ড সম্বলিত মা দুর্গার কোমরবন্ধ। ইহা গুরুদেব কলিকাতা হইতে তৈয়ারী করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

যে বৎসর ধাতুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বৎসর সপ্তমী পূজার দিন সকালে গুরুদেব শিব ঘরে আসিয়া মার পূজা করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া সেইবারেই পূজার ভারপ্রাপ্ত

হরমোহন দাদাকে সব দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সব জোগাড় শেষ হইবার পূর্বেই গুরুদেব পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহার পূর্বেই আমরা সকলে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম। পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া হরমোহন দাদা গুরুদেবকে বিরক্ত করিবার ভয়ে ঘরের এক প্রান্তেই “ন যদি ন তস্থ্যে” অবস্থায় রহিয়া যান। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা পূজা শেষে আমাকে বর্ণনা করিলেন। তিনি দেখিলেন যে গুরুদেব একটির পর একটি কলা মাকে ভোগ দিতেছেন এবং দেবী তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এই সময়ে খুব মৃদুস্বরে দুর্গাদেবী গুরুদেবের সহিত কিছু কথা কহিতেছিলেন। কেবল মাত্র স্বরই হরমোহন দাদা শুনিয়া-ছিলেন, কোনও কথা বুঝিতে পারেন নাই।

গোপালজীউর হাতে যে সোনার নাড়ু রহিয়াছে তাহা কে গড়াইয়া দিয়াছেন জানি না, তবে এইবারে শুনলাম যে নাড়ু হাতের সহিত এমন ভাবে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহার কিছু মাত্র নড়চড় হয় নাই। অনেকেই সেইজন্য মনে করেন যে গোপালের হাতে বরাবরই ঐ নাড়ু ছিল, কিন্তু তাহা নহে। গোপালের হাত ১৯১৫ সালে বর্ধমান যাইবার পূর্বেও খালি ছিল। ১৯২৮ সালে যখন আমাদের বাটীতে জন্মাষ্টমীর সময় ছিলেন তখনও হাত খালি ছিল।

আমার মনে হয় ১৯২৮ সালে বিজ্ঞান মন্দিরের কার্য সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। তাহা শেষ হইতে আরও এক বৎসর সময়

লাগিয়াছিল। সূর্য্য-বিজ্ঞানের নিমিত্ত শিক্ষাচত্বর ও তৎসংলগ্ন গৃহ ১৯৩২ সালে যখন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার কিছু পূর্ব্বেই বোধ হয় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

*

*

*

আজ লিখিতে বসিয়া হঠাৎ মনে পড়িল যে যে-রূপ সোনার চাঁপা দিয়া কুম্ভীদেবী শিবপূজা করিয়াছিলেন, শ্রীগুরুদেব সেইরূপ একটি জিনিষ আমার দীক্ষার অনেক পূর্ব্বে আমাকে দেখাইয়াছিলেন। কোথায় দেখাইয়াছিলেন বা আর কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি না মনে করিতে পারি না। জিনিষটি প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে একটি ছোট মুচকুন্দ ফুলের ত্রায় এবং সেইরূপ গন্ধ বিশিষ্ট—তবে আরও জোর ও অতি স্নিগ্ধ। সাধারণ চাঁপা ফুলের মতন তীব্র গন্ধ নহে। কলিকাতার গড়ের মাঠে সেই সময় ঐ ফুলের অনেক গাছ ছিল এবং মাঠে যাহারা বেড়াইতে যাইতেন সকলেই সেই গন্ধের সহিত পরিচিত ছিলেন। কাজেই যে গন্ধ আমি ঐ ফুল হইতে পাইয়াছিলাম তাহার পরিচয় আমার অজ্ঞাত ছিল না। কি আলোচনা ক্রমে ঐ ফুল দেখাইয়াছিলেন তাহা মনে নাই।

আর একটি অল্প প্রকারের ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ইহাও আমার দীক্ষার পূর্ব্বের ঘটনা। একবার শ্রীগুরুদেব আমাদের বাটী থাকা কালে বিধুবাবু শাঁখারি পাড়ার বাটীতে তাঁহার ভোগ দেন। আহাৰাদির পর একটি ঘোড়ার গাড়ীতে

বাঁটা ফেরা হইতেছিল । গুরুদেব সহিসের দিকে বসিয়া আমাকে তাঁহার পাশে বসিতে বলিলেন । বসিলে পর, তিনি তাঁহার এক হাত আমার ঘাড়ের উপরে রাখিয়া আমার দিকের strap ধরিলেন । গাড়ীতে আমাদের বাঁটা আসিতে এক মিনিট আন্দাজ সময় লাগিল । ঐ সময় বরাবর তাঁহার হাত আমার ঘাড়ের উপর রাখা ছিল এবং আমি এক অপূর্ব স্পর্শ সূত্রে মুগ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম । সে স্পর্শ স্মৃতি আজও আমি ভুলি নাই ।

দুটিই তাঁহার অহেতুক কৃপার নিদর্শন । একটি চন্দ্রচক্ষে দেখিলাম এবং পরে ভুলিয়া গিয়াছিলাম । দ্বিতীয়টি স্পর্শেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া মনে গভীর ভাবে আঁক কাটিয়া দিল । প্রথমটি অবাস্তব জগতের, দ্বিতীয়টি স্থূল বাস্তব জগতের ব্যাপার । আমরা স্থূল জগত লইয়া আছি বলিয়া স্থূলের ভিতর দিয়া যে লীলা প্রকট হয় তাহার মাধুর্য্য মনকে সহজেই অভিভূত করে । নিজের চেষ্টায় স্থূল শরীরের সাহায্যে যখন সূক্ষ্মের আভাস পাই তখন যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার চেয়ে যে আনন্দ বিনা আয়াসে শুধু কৃপাবশে পাওয়া যায়, তাহা অনেক বেশী । ঐ সব দৃশ্য দ্রষ্টার পক্ষে অতি মূল্যবান, কারণ তাহা হইতে দ্রষ্টার ভিতর উত্তম পরমাণুর সমাবেশ হইতেছে বুঝা যায় এবং তাহা দ্বারা উত্তম পরমাণু সংগৃহীতও হয় ।

এইস্থানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । ইহা আমার দীক্ষার পরের ঘটনা—১৯২৯ সালেব পর । তখন গরম

কাল। শ্রীগুরুদেব আমাদের বাটীতে আছেন। তখন খুব সকালেই তিনি গাড়ীতে Eden Garden এ ঘাইয়া কয়েক পাক হাঁটিয়া বেড়াইতেন। ঐ সময়ে একদিন ঘুম হইতে উঠিয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম তখন তিনি বলিলেন, “তোমার কি ঘুম! ভোর বেলায় যখন তোমাকে ডাকিলাম তখন তুমি উঠিয়া আবার শুইয়া পড়িলে।” ঐ দিন শেষ রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমার মনে হইয়াছিল কে যেন আমাকে ডাকিতেছে এবং উঠাইবার জন্ত হাত ধরিয়া টানিতেছে। আমি উঠিয়া খাঁটের উপর পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। শ্রীগুরুদেবের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি ঐভাবে আমাকে ডাকিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন যে তাঁহার আছিকের ঘরে দুই দিব্যমূর্তির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে দেখাইবার জন্ত আমাকে ডাকিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে উঠিয়া আসিলে আমি তাঁহাদের সাক্ষাৎকার পাইতাম। তমোগুণাচ্ছন্ন আমি ঐ পুণালাভে বঞ্চিত হইলাম এবং বিশিষ্ট পরমাণু সংগ্রহে অসমর্থ হইলাম।

এই প্রসঙ্গে স্থূল জগতের লাভালাভ বিষয়েও শ্রীগুরুদেবের অযাচিত করুণা বর্ণিত হইলেও প্রারব্ধ বশাৎ তাহা গ্রহণে শিষ্য কি ভাবে অসমর্থ হয় তাহার এক দৃষ্টান্ত নিজের জীবনের এক ঘটনার দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার কথা যদি সেদিন শুনিতাম বা তাহার যথোচিত মূল্য দিতাম তবে পরবর্তী সমস্ত জীবন আমার অন্তরূপ ধারণ করিত।

শ্রীগুরুদেব কখনও শিষ্যদের ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর বিষয়ে স্পষ্ট মত তাহাদিগকে দিতেন না। যাহারা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিতে সাবধান করিয়া দিতে শুনিয়াছি। যিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন তিনি লাভবান হইতেন।

একদিন রাত্রে আছিকের পর রূপনারায়ণ নন্দন লেনস্থ আশ্রমে যখন তাহাকে প্রণাম করিতে যাইলাম তখন দেখিলাম তিনি পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছেন এবং পরমেশ্বর অঙ্গ সেবা করিতেছে—ঘরে সে সময় আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। তাহাকে প্রণাম করিয়া দুই এক কথার পর, যেমন সব কথাই তাহাকে বলার অভ্যাস ছিল সেই ভাবে বলিলাম যে আমি এক কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়াছি এবং তাহার দর বাড়িয়াছে—ফলে আমার প্রায় ৪০০ টাকার মতন লাভ হইতে পারে। শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ সামনে ফিরিয়া শেয়ার কেনা বেচা করা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে জোরের সহিত নিষেধ করিলেন।

আমার কিন্তু মনে হইল যে গুরুদেব এই ব্যাপারের কিছু বুঝেন না, সেইজন্য নিষেধ করিলেন। ফলে সে ব্যাপারে আমার লাভ হইল বটে, কিন্তু ঐ ব্যসন বা নেশা ছাড়িতে পারিলাম না এবং ফলে দুই তিন বৎসরের মধ্যে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িয়া সর্বদাই সেই বিষয়ের জন্য উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল থাকায় মনে বিমর্শ ভাব আসিয়া পড়িল। শ্রীগুরুদেব কিন্তু ঐ প্রথম দিনের নিষেধের পর আর দ্বিতীয়বার আমাকে নিষেধ করিলেন না এবং

আমিও তাঁহার আদেশের ব্যতিক্রমে বিশেষ কষ্ট পাইতে লাগিলাম, শেষে ক্রমে ক্রমে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করিলাম। তিনি কিন্তু মর্ষদাহের মধ্যেও প্রায়ই বলিতেন “চিন্তা করো না রে আর—ধীরে ধীরে এ গভীরে করে দিব পার।” পার তিনিই করিয়া দিয়াছেন—নিজের কৃতিত্বে পার হই নাই।

সমস্ত ব্যাপারের ফলে অন্তর্নিহিত যে ব্যসন প্রবৃত্তি ছিল তাহা নষ্ট হইল এবং কষ্টে পড়িয়া ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করার ফলে মানসিক উন্নতিও সাধিত হইল। যদি সেদিন শ্রীগুরুদেবের নিষেধ বাক্য শুনিতাম তবে ভবিষ্যৎ জীবন সম্ভবতঃ অনেক শাস্ত ও সমাহিত ভাবে অতিবাহিত করিতে পারিতাম। কিন্তু মনের ভিতর যে আর এক প্রবল প্রবৃত্তি ছিল—ভোগ সুখের বাসনা ও অর্থলালসা—তাহা সুখী ভাবে চলিতে চলিতে আরও বাড়িয়া যাইত। এ প্রবৃত্তির কথা মনে করিয়াই শ্রীগুরুদেব প্রায়ই আমাকে বলিতেন, “দরিদ্র ইন্দ্রজ লাভে কতটুকু সুখ পাবে?”

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন সকালে ভবানীপুরের বাটীতে শ্রীগুরুদেব বলিলেন যে যুধিষ্ঠির যখন যমপুরী গিয়াছিলেন তখন যমরাজ স্বয়ং তাঁহাকে যে মিষ্টান্ন দিয়া আবাহন করিয়াছিলেন আজ তাহা তৈয়ার করিয়া খাওয়াইবেন। একটি পাথরের গ্লাসে ফোকাস করিয়া নীল কাগজে মুড়িয়া গ্লাসটি রোড়ে রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে বুঝা বুঝা অল্প হুতাক্ত মিহি পোস্ত দানার আয় প্রায় আধ গ্লাস জিনিষ তৈয়ারী হইল। সূর্য্য-বিজ্ঞানে প্রস্তুত

সন্দেশের ত্রায় যুক্ত নহে ও পেশাই করা ছানার ত্রায় নহে।
 স্বাদ ও গন্ধ ঐ জিনিষের অপূর্ব হইলেও আগে আগে তৈয়ারী
 সূর্য্য-বিজ্ঞানের সন্দেশ হইতে পৃথক্। আমার কাছে ব্যাপারটি
 খুবই অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। কবে কার ঘটনা, কোন্ জগতের
 ঘটনা, হঠাৎ সেইদিন সকালে গুরুদেবের চিত্তাক্রান্ত হইল কেন?
 সেই সন্দেশ সেদিন যে সব গুরুভাই উপস্থিত ছিলেন সকলেই
 থাইয়াছিলেন।

শিবের গীত গাহিতে বসিয়া অনেক ধান ভাজিলাম।
 আমার ব্যক্তিগত জীবনে এই সব ব্যাপার ঘটই মূল্যবান হউক
 না কেন অপরের পক্ষে তাহার মূল্য খুবই কম মনে হয়।
 সেইজন্য যে ঘটনা বাস্তবধর্মী নহে বা বাহ্য দ্রষ্টা নিজের ইচ্ছায়
 অপরের কাছে প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহার আলোচনা
 সাধারণের নিকট সমাদৃত না হইলে দুঃখের কিছুই নাই।

শুল বিগ্রহের সেবা পূজায় নিজের চেষ্টায় ও তাঁহার কৃপার
 সংমিশ্রণে মনের আনন্দ ও সামগ্রিক উন্নতি বোধ করিতে
 করিতে সেই বিগ্রহেরই উপর একটা ভক্তি ভাব আসিয়া পড়ে
 এবং তাঁহার সন্মুখে সামান্য তথ্যাদি জানিতে বা সেই বিষয়ের
 আলোচনা করিতে ভাল লাগে—এই মনে করিয়া আশ্রমে
 প্রতিষ্ঠিত গোপালজীউ, পাদপদ্ম, মা দুর্গা, জ্যোষ্ঠাগুরুদেবের
 আসন ও আশ্রমস্থ শ্রীগুরুদেবের মর্ম্মর মূর্ত্তি সন্মুখে যতদূর মনে
 করিতে পারি লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। সব বিষয়গুলি বহু
 পূর্ব্বকার এবং শ্রীগুরুদেবের দেহাবস্থিত কালের ঘটনা—যখন

তঁাহার প্রভাবে স্থূল সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়গোচর অতীন্দ্রিয়, এক কথায় প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষের মধ্যে কোথায় ছেদ, কোন ছেদ একান্ত আছে কি না, বলা অসম্ভব ছিল।

* * *

“বিশুদ্ধ কাননের” ইতিবৃত্ত লিখিতে কিছু পুরাতন চিঠি পত্রের মধ্যে শ্রীগুরুদেবের কাশী আশ্রম হইতে ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪১ সালের আমাকে লিখিত পত্র পাইলাম। ইহা আমার কাকা শ্রীঅতুলচন্দ্র বসুর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে লিখিত। নিম্নে পত্রাংশ কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

“পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সমস্তই পরম মঙ্গলময়ীর ইচ্ছা। ক্ষয় ধর্মশীল জগৎ—উদ্ভব হইলে নিশ্চয়ই নিধন হইবে। যাহা আছিকের সময় দেখিয়াছ তাহা অমূলক বলিয়া মনে করিবে না। ঐরূপ অনেক সময় হইয়া থাকে। তুমি আছিকের যাহা ব্যবস্থা করিয়াছ সেইরূপই করিবে, কারণ মৃত্যুশৌচে আছিকের আসনে বসা, সেই কাপড় পরা বা সেই ঘন ব্যবহার করা নিষেধ। মালা জপিতে পার।”

যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা এইবার লিখিতেছি। আমি বরাবরই যখন শ্রীগুরুদেব ভবানীপুরে না থাকিতেন তখন তঁাহার গৃহে আছিক করিতাম। কাকার মৃত্যুর দিন কয়েক পর একদিন সকাল বেলায় আমার কাকার পূর্ণাঙ্গ অশরীরী বায়বীয়

ভাগ]

শ্রীগুরু-স্মৃতি ও কয়েকটি কথা

৮৩

মূর্তি দেখি। সূক্ষ্ম শরীর আমি আগে দেখিয়াছি। তাহা হইতে ইহা ভিন্ন—সূক্ষ্ম শরীর অপেক্ষা কম ঘন ও কম উজ্জ্বল। তিনি আমাকে বলিলেন, “এখন হইতে দুই তিন বৎসর আমি পাশের ঘরে (অর্থাৎ যে ঘরে শ্রীগুরুদেব বসিতেন) থাকিব, পরে অন্য কোথাও* যাইব।” ইহার পর মূর্তি মিলাইয়া গেল। কোতুহল বশে এই দেখার কথা শ্রীগুরুদেবকে লিখিলে তিনি পূর্বোক্ত প্রকার উত্তর দেন। শ্রীগুরুদেবের সমর্থন রহিয়াছে বলিয়াই ঘটনাটি প্রাধান্য যোগ্য। তত্ত্ব ব্যাখ্যার একটি empirical experience জানাইলাম।

মন্তব্য—*কথার ভাবেও স্বরে মনে হইয়াছিল তিনি কোথায় যাইবেন সে বিষয়ে তাঁহার পরিকার ধারণা ছিল না।

বাবার কৃপা

শ্রীশিবরানী দাসী

১৩৩৯ সালে বাবার কাছে আমি গিয়াছিলাম। আমার একটি মেয়ের প্রথম বারের ছেলেটি নষ্ট হয়ে যায়। পরের বারে যখন সে আবার সন্তানসম্ভবা হইল, তখন আমি বড় বড় সাধুদের কাছে শান্তি-স্বস্তায়নের জন্য চিঠি-পত্র লিখি। তাহার উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, “এবারে গাছ বাঁচিবে না, ফলের আশা করছ কেন?” আমার দিদি তখন বাবার শিষ্যা। আমি কান্নাকাটি করিলে দিদি বলিলেন, “চল, তোমায় বাবার কাছে লইয়া ঘাই।” আমি বলিলাম, “না দিদি, আমি যাইতে পারিব না, আমার ভয় করে। বাবা আমাকে যদি কিছু বলেন।” তখন আমার ছোট ভাই বাবার কাছে দীক্ষা লইবার জন্য কলিকাতায় ভবানীপুরে আসিতেন। আমার বড় ভাইয়ের একটি ছেলে হইয়াছিল। তাহার স্মৃতিকা পূজার আগের দিন হঠাৎ আমার ছোট ভাই এসেছিলেন। তখন আমার দিদি বলিলেন, “মোহন, তুই যাবি?” মোহনদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইব?” দিদি বলিলেন, “বাবার কাছে।” “সেইজন্মই ত এলুম।” তারপর দিন দিদি বলিলেন, “আমি ইচ্ছা করিতেছি সঙ্গে রাণীকে লইয়া ঘাইব—ও বড় কান্নাকাটি করে, কিন্তু রাণী যেতে চাহিতেছে না।” বাবার কাছে তিন ভাইবোনে গেলাম।

বাবা তখন তাঁহার ছেলেদের সহিত গল্প করিতেছিলেন। আমরা মেয়েদের ঘরে গিয়ে বসিলাম। একটি ছোট মেয়ে (কুমারী মা) বাবার হাত ধরে আমাদের ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। বাবা সেই মধুমাখা কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিগো, কেমন আছ?” আমি তখন খুব কাঁদিয়া ফেলিলাম। উত্তরে বলিলাম, “আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি কেমন আছি।” বাবা আমায় বলিলেন, “অনেক ত ভেবেছ, ভেবে আর কি করিলে?” আমি বলিলাম, “যখন আমি মরিয়া বাইব চিত্রগুপ্ত যখন আমায় জিজ্ঞাসা করিবে, কি কাজ করিয়াছ, আমি তখন বলিব, কাজ করিব কোথা থেকে—একটি সম্ভান দিয়ে তুমি আবার নিয়ে নিতেছ, সুতরাং পাগল হওয়া ছাড়া আমার অন্য পথ নাই।” বাবা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “ভাবনা ছাড়া কি মানুষ আছে! তুমি ভাবছ তোমার মেয়ের ভাবনা, আমি ভাবছি যে আমি যা পেয়েছি তা রাখব কোথায়? কাজ কর, তোমার ভাবনা তিনি ভাববেন।” আমি তার উত্তরে বলিলাম, “কি করে কাজ করিব। পূজার আসনে বসিলে মেয়ের ভাবনা ভাবি, মেয়ে হেসে উঠল কি তাড়াতাড়ি ছুটে গেল এই চিন্তায় থাকি।” বাবা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আজ একজনের দীক্ষা হইয়াছে, স্নানজল নিয়ে যাও।” আমি শুনিয়া বলিলাম, “স্নানজলে কি হয়?” বাবা তার উত্তরে বলিলেন, “ঘাতে দিবে তাইতে উপকার পাবে।” আমি বলিলাম, “আমি ত কোন পাত্র নিয়ে আসিনি যে স্নানজল নিয়ে যাব।” বাবা বলিলেন, “পরমেশ্বরের নিকট হইতে একটা গ্লাস চেয়ে নিয়ে

এস।” পরমেশ্বর আমাকে একটি মাটির ভাঙ্গা গ্লাস দিলেন, তাইতে করে আমি স্নানজল লইয়া আসিলাম। আসিয়া মেয়েকে খাওয়াইয়া দিলাম, বাকীটুকু রাখিয়া দিলাম। সেইদিন আমার বড় ভাইয়ের ছেলের স্মৃতিকা পূজা ছিল। আমাদের বাড়ীর পূজার জিনিষ পরিষ্কার করিতে ছিল, সেই সঙ্গে স্নানজল ও ফুলপাতা সব ফেলে দিয়েছিল। আমি দেখি খালি গ্লাসটিতে কড়ি তুলে রেখেছে। তাহা দেখিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলাম। সেই দেখে আমার দিদি বলিলেন, “এ বাবার ছলনা—বাবা তোমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, ঐ গ্লাস যখন আছে তখন উহাতেই জল দিয়ে রাখো, উহাই স্নানজল হইবে।” আমি বলিলাম, “স্নানজল যেন হইল, কিন্তু বাবার ফুল বিষপত্র কোথায় পাইব?” দিদি বলিলেন, “বাবার খেলা, সব হবে।” তারপর দিন উঠিয়া দেখি ঘরে খুব ভুরভুর করিতেছে গন্ধ, তাড়াতাড়ি সেই গ্লাসের ঢাকা খুলিয়া দেখিতেছি একটা ফুল ও বিষপত্র রহিয়াছে। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন ২০শে আশ্বিনের এদিকে সন্তানাদি হইবে না। আমি বাবাকে বলিয়াছিলাম ২০শে আশ্বিন সপ্তমী পূজা। বাবা আমাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি পূজা করিও।” আমি বলিয়াছিলাম, “কি করিয়া পূজা করিব। ঠাকুর স্পর্শ করিলে যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে কি করিয়া পূজা করিব। আমি বরং ব্রাহ্মণকে যোগাড় করিয়া দিই।” তাইতে বাবা বলিলেন, “তুমি ঠিক মত কাজ করে যাও, তোমার ভাবনা তিনি ভাবিবেন।” ওরা ভাদ্র, সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ আমার মেয়ে বলিল যে আমার পেট ব্যথা করিতেছে। দিদিকে ডাকিলাম “শীঘ্র এস, বুলুর পেট ব্যথা

করিতেছে, বলিতে বলিতে তখন রাত্রি নয়টা হইবে একটি পুত্র
 ভূমিষ্ঠ হইল। এমন ছেলে যে দেখিলে ভয় হয়, গায়ের চামড়া
 হয় নাই ও চোখের পাতা হয় নাই। আমরা তখন আর কি
 করিব, তাড়াতাড়ি বাবার স্নানজল আনিয়া গালে দিলাম। ছেলেটি
 তখনি চুকচুক করিয়া খাইয়া ফেলিল। অপুষ্ট ছেলে দেখিয়া
 আমাদের বড় ভয় হইয়াছিল, বাবার স্নানজল খাইতে আমাদের
 সাহস হইল। সেই ছেলে বড় হইল, লেখাপড়া শিখিল,
 বিলেত গেল। তখন কেবলই বাবার কাছে কাঁদিতাম ও
 জানাইতাম। বাবা, কবে পাশ করিয়া ঘরে আসিবে, বারে
 বারেই শুনিতাম, “পারিলাম না।” একবার স্বপ্ন দেখিতেছি
 যেন বাবা নিজে এসেছেন একটি কুমারী মায়ের হাত ধরে।
 আমায় বলিলেন, “তুমি এত ভাবছ, তুমি কি কুমারী মায়ের
 বেনারসী কাপড় মেনেছ?” আমি স্বপ্নে বলিলাম, “হ্যাঁ, আমি
 তাই দিব। আমার নাভিকে আনিয়া দিন।” সেই বছরেই
 ডিসেম্বর মাসে আনিয়া দিলেন। বাবার কুপায় আমি যখনই
 যা চাই, তখনই বাবা বলেন, “তোমার ভাবনা কি?” সর্বদাই
 যেন বাবার ঐ চরণে মতি থাকে। আমি ত বাবা ছাড়া আর
 কিছুই জানি না।

গুরু-স্মৃতি *

ঐতিহ্যভিষগ বিশ্বাস

শ্রীগুরুদেবের যোগ বিভূতির নিদর্শন নিম্নলিখিত দুই একটি ঘটনা যাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা অনুভব করিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। কয়েক বৎসর পূর্বে ঐকালীধামে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত কৈদার ঘাটের নিকট আশ্রমে বাস করা কালীন আমার একজন গুরুভ্রাতা ভয়ানক কঠিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় এবং তজ্জন্ত প্রত্যহ ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া যাইত। একদিন প্রাতঃকালে সেই পীড়িত গুরুভ্রাতার জ্বর দেখিবার জন্ত Thermometer আবশ্যক হয় কিন্তু সেই সময়ে আশ্রমে কাহারও নিকট থার্মোমিটার ছিল না। শ্রীশ্রীগুরুদেব সেই সময়ে একটি নূতন Hicks Thermometer আকর্ষণ করিয়া আনিয়া আমার হস্তে দিলেন। আমি জ্বরের তাপ নিরীক্ষণ করিয়া উক্ত দ্রব্যটি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবা, এই Thermometer টি কোথায় পাইলেন?” তিনি বলিলেন, “উক্ত তাপ যন্ত্রটি কলিকাতার বি. কে. পালের ষ্টল হইতে আনা

*এই লেখাটি বহু দিনের পূর্বেকার। “বিগ্ৰহানন্দ প্রসঙ্গে”র নীলা কথার জন্ত পাইয়াছিলাম। তখন প্রকাশ করার অবসর ছিল না। তাই এখন প্রকাশ করা হইল।

—সম্পাদক।

হইয়াছে এই ক্ষণেই যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। তাঁহার হস্তে থার্মোমিটার যাইবা মাত্র উহা দুই এক মিনিটের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

২। একবার গুরুদেবের সহিত বিদ্যাচলে গিয়াছিলাম, সেখানে এক পাণ্ডার বাড়ীতে পরমহংসদেব জীবনের প্রথম অবস্থায় গমন করিতেন। সেই পাণ্ডা এখনও জীবিত আছে এবং আমার তথায় উপস্থিতি কালে প্রায়ই আসিত। উক্ত পাণ্ডা বাবার যোগ বিভূতি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইত্যবসরে হঠাৎ গুরুদেবের জন্ম সাবানের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। বাজার হইতে সাবান কিনিয়া আনিবার সঙ্কল্প হইতেছে, কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তথায় সাবান পাওয়া কঠিন। কিছুক্ষণ পরে গুরুদেবের ঘরের টেবিলের উপর একখানি সুন্দর নূতন সাবান রহিয়াছে দেখা গেল। উক্ত সাবানটি ইচ্ছাশক্তি বলেই হইল, কি সূর্য্য-বিজ্ঞানে হইল তাহা আমার স্মরণ নাই।

৩। ৩কালীর পুরাতন আশ্রমে অবস্থান কালে যখন নূতন আশ্রম সংগঠনের কার্য চলিতে থাকে সেই সময়ে একদিন আমার পিত্ত পাথুরির বেদনার সূচনা হয়। আমি আশ্রমের এ কার্য সে কার্য করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছি এবং ভীষণ যন্ত্রণার ভয়ে চিন্তাকুল হইয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু দয়াময় গুরুদেবের কৃপায় আমাকে আর সেই দিন সেই কঠিন যন্ত্রণা

ভোগ করিতে হইল না। তিনি আমার ব্যাধিটি কিছুক্ষণের জন্য টানিয়া লইলেন ও নিজেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইল ও খসখসের গন্ধে আমার দেহ ভরিয়া গেল। ভগবান গুরুদেবের কি প্রকার কষ্ট হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করায় বলিয়া ছিলেন যে উক্ত শারীরিক ক্লেশ মানসিক বলের দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

৪। একবার চন্দন নগরে এক বিশিষ্ট গুরুভ্রাতার বাটীতে অবস্থান কালে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয় এবং হঠাৎ একদিন অজ্ঞান হইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়ি। সেইদিন বৈকালে কিছু সুস্থ হওয়ার পর আমাকে উক্ত গুরুভ্রাতার ত্রিতল গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। সেই গৃহে আমাকে দেখিবার জন্য দুই তিন জন লোক ছিল। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে এবং সকলে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত তখন একটি প্রখর জ্যোতিঃ আমার শরীরের উপর আসিয়া পড়িল। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া পড়িল, শরীর রোমাঞ্চ হইল এবং দুই এক মিনিট পরেই গুরুদেবের কথার স্বর আমার কর্ণে গেল, আমি উঠিয়া পড়িলাম, কিন্তু গুরুদেবকে দেখিতে পাইলাম না। আমার চক্ষু এবং কর্ণের সত্তা থাকিলে উক্ত ঘটনা প্রকৃত সত্য। সেই সময়ে গুরুদেব ৩কালীধামে অবস্থান কবিতেছিলেন। প্রায় চারিশত মাইল দূর হইতে কি প্রকারে আসিলেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

প্রার্থনা

শ্রীপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

জীবন মরুর দারুণ তৃষা দিনগুলি যায় নিয়ে,
 বুখা দাবী মিটিয়ে চলি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ।
 মিথ্যা সুখের আশায় ঘুরি হয়ে পাগল পারা,
 অলীক নিয়েই মেতে আছি, বন্ধ জীবন কারা ।
 প্রভাত আসে যথারীতি কাজের বোঝা হাতে,
 সন্ধ্যা আসে ক্লান্তি নিয়ে, শ্রান্তি আসে রাতে ।
 আনন্দেরও পরশটুকু নেইকো কোনও খানে,
 অর্থ বিহীন জীবনটাকে টানছে শেষের পানে ।
 ফুরিয়ে যাবে হঠাৎ এটা বিরাট বুখার মাঝে,
 জানবে নাক জগৎ মাঝে অথও সুখ রাজে ।
 জানবে নাক আনন্দ যোগ, ভূমার নিমন্ত্রণ,
 জানবে নাক ক্ষণেক তরে সুখের পরশন ।
 ভুলের বোঝা বেড়ে যাবে দিনের সাথে সাথে,
 শেষের দিনে যাবে চলে লজ্জানত মাথে ।
 সুখ দিইনি ভুলেও কারেও, সুখ পাইনি নিজে,
 তবু কাজের মাঝে কাটাই বেল, অর্থ ইহার কী যে ?
 জানি নাকো ব্যর্থ বোঝার বিপুল এ সঞ্চয়
 কবে তোমার পরশ, চিরতরে করবে এদের ক্ষয় ?

হে যোগিরাজ, আছি চেয়ে তোমার পরশ তরে,
 বৃথা দিনের কাজের ডালি দেবো তোমার করে ।
 চেয়ে নেবো তোমার থেকে গভীর আশীর্বাদ,
 চেয়ে নেবো তোমার কাছে ভূমানন্দের স্বাদ ।
 অর্থ আনুক জীবনটাতে তোমার আলোর জ্যোতি;
 চরম পুলক আনুক মনে, বিপুল অনুভূতি ।
 বারে পড়ুক সকল রিপু শুখনো পাতার মতো,
 ভস্ম হোক, জীবন ভরা মান অভিমান যতো ।
 ভরিয়ে তুলুক জীবনটাকে তোমার স্থিত হাসি,
 নামুক আমার জীবন ঘিরে পদ্মগন্ধ রাশি ।
 রাতুল তোমার চরণতলে নীরব প্রণতি,
 রেখো আমায় অভয় পদে এইতো মিনতি ।

মানস পূজা

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

(১)

গুরু-ধ্যান ও গুরু-প্রণাম

সর্বপ্রথম গুরু ধ্যান ও গুরু নমস্কার মাস্ট্রলিক কার্যের পূর্বে আবশ্যক, কারণ গুরু চিন্তাজনিত শক্তিতে শক্তিমান না হইয়া সূক্ষ্ম উপাসনা মার্গে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। এই ধ্যানটি স্বরূপতঃ নিত্য গুরুর হইলেও আপাততঃ তাঁহার বাহ্যরূপ আচার্য্য গুরুর মূর্তির ধ্যান। ইহা অনুলোমে ও বিলোমে করিতে হয়। গুরুর চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি অঙ্গ ক্রমে ক্রমশঃ দেহের উর্দ্ধ ভাগ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে হয় এবং ভাবনা বলে তাঁহাতে চিত্ত লগ্ন করিতে হয়। এইভাবে ক্রমশঃ মস্তকের শিখা স্থান পর্য্যন্ত চিন্তা করিলে ধ্যানের অনুলোম অংশ অনুষ্ঠিত হয়। এই ধ্যান বা রূপ চিন্তা শ্বাস নিতে নিতে অর্থাৎ পুরকের সহিত কর্তব্য। ইহা হইল গুরু মূর্তির অঙ্গ সকলের ক্রমিক ধ্যান। ইহার পর মস্তকের উর্দ্ধতম স্থানে আরুঢ় হইয়া কুণ্ডকের সহিত শ্রীগুরুর সমগ্র দেহ যুগপৎ সর্বাস্ত্র সহ অথও চিন্তা করিতে হয়। কিছুক্ষণ এই প্রকার করিয়া ধ্যানের বিলোম দ্বারা আরম্ভ করিতে হয় অর্থাৎ মস্তক হইতে প্রতি অঙ্গ ক্রমে নামিতে নামিতে পাদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত চিন্তা করা আবশ্যক।

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বায়ুর রেচন কর্তব্য। প্রথমে পুরক তাহার পর কুস্তক তাহার পর রেচক। শ্রীগুরুর পাছকা চিন্তা করিবার পর নিজে সাষ্টাঙ্গ ভাবে ভাবনা দ্বারা ঐ চরণে প্রণাম করিতে হয়। ইহা আত্মনিবেদনের ক্রিয়া। ইহার ফলে গুরু সত্তা ও গুরু শক্তি সাধকের মধ্যে আপুরিত হয়। অনুলোম ধ্যানে লৌকিক ভেদ ভাব ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে এবং গুরুর নিরোদেশ ধ্যানের সময় গুরুর সহিত অদ্বৈত ভাব উপস্থিত হইবে। সৰ্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ গুরু দেহের চিন্তন বাস্তবিক পক্ষে নিজ স্বরূপেরই চিন্তন রূপে পরিণত হয়। ইহাই অভেদ স্থিতির অবস্থা। ইহার পর অবরোহ ক্রমে বিলোম চিন্তার ফলে অভেদ ভাব হইতে ক্রমশঃ অলৌকিক ভেদ ভাবের উন্মেষ হয়। তখন নিজেকে অণু ও গুরুকে মহান্ বলিয়া ধারণা হয়। তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণামে অথবা আত্মসমর্পণ যোগে ঐ অণুকেও মহানের মধ্যে বিসর্জন দিতে হয়। করার ফলে সাধকের আধার অহঙ্কার শূন্য হওয়াতে গুরু সত্তাই শুদ্ধ অহংরূপে অর্থাৎ অপ্রাকৃত স্বরূপে সাধক দেহে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে।

(২)

ইষ্টমূর্তির আবির্ভাব

সাধনা প্রাকৃত দেহে হয় না। শুদ্ধ অথবা অপ্রাকৃত দেহ ব্যতীত প্রকৃত সাধনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সাধকের বাহ্য দেহ শুদ্ধ দেহ নহে, কারণ উহা মায়িক দেহ। ভাবনা দ্বারা উহাকে শুদ্ধ বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে। মায়িক

দেহ যে কোন স্তরের হউক সবই মলিন। নিম্ন স্তর হইতে উর্দ্ধ স্তরে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ থাকিলেও এবং সেই হিসাবে উর্দ্ধ স্তরের দেহ অপেক্ষাকৃত অধিক শুদ্ধ হইলেও কোনটিই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় পদার্থ নহে। কারণ মায়িক সত্ত্বগুণ হইতে রজোগুণ ও তমোগুণ একেবারে পৃথক্ হয় না। এইজন্য মায়িক দেহে প্রকৃত উপাসনা চলে না। কারণ উপাস্ত্র ও উপাসক এক ভূমির না হইলে ঠিক ঠিক উপাসনা হইতে পারে না। উপাস্ত্র রূপ অপ্রাকৃত হইলে উপাসকের দেহও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বই বিন্দু। এই বিন্দু হইতেই ইষ্টদেবতার দেহ কল্পিত হয়। বিন্দু কুণ্ডলিনীরই নামান্তর। কিন্তু ইষ্টদেহ কুণ্ডলিনী হইতে উদ্ভূত, কিন্তু সাধকের মায়িক দেহ কুণ্ডলিনী হইতে উদ্ভূত নহে— উহা মায়া হইতে উদ্ভূত। কিন্তু সাধকের দেহের উপাদান যে মায়িক সত্ত্ব তাহার পৃষ্ঠভূমিতে শুদ্ধ সত্ত্ব বা বিন্দু আছে, তবে উহা নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয় বিন্দুকেই আমরা নিদ্রিত কুণ্ডলিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি। কিন্তু সদগুরুর কৃপা কটাক্ষ পতিত হইলে বিন্দু কল্পিত হইতে থাকে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। কুণ্ডলিনীর এই নিদ্রা অনাদি নিদ্রা রূপে পরিগণিত। কারণ এই নিদ্রার আদি আছে স্বীকার করিলে নিদ্রার পূর্বে কুণ্ডলিনীর জাগরণ ছিল ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু ইহা দ্বৈত দৃষ্টিতে বলা। অদ্বৈত দৃষ্টিতে অনাদি নিদ্রার প্রশ্ন উঠে না। কৃপাশক্তি চিৎশক্তি, কিন্তু বিন্দু বা শুদ্ধ সত্ত্ব মায়াভীত হইলেও চিৎশক্তির স্বরূপ নহে, কিন্তু শুদ্ধ অচিৎ। ইহাই শুদ্ধ সৃষ্টির উপাদান। গুরুর অনুগ্রহ

শক্তি সাধকের বিন্দুতে সঞ্চারিত হইলে বিন্দু কম্পিত হইয়া নাদ এবং জ্যোতির সৃষ্টি করে। এই দুইটিকে আশ্রয় করিয়াই সাধকের শুদ্ধ দেহ এবং তাহার ইষ্টের শুদ্ধ দেহ উদ্ভূত হয়, কারণ সাধক থাকিলেই সাধ্য থাকিবেই। সাধক ও ইষ্টের অনন্ত রূপ ও পরস্পর অনন্ত সম্বন্ধ বিद्यমান। কিন্তু সবই ভাবময়—সাধকের নিজের যে ভাব তাহার আপুরক ভাবটিই তাহার ইষ্টের ভাব। একদিকে তৃষ্ণা থাকিলে অপর দিকে যেমন জল থাকা স্বাভাবিক—কারণ এই উভয়ের যোগে সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়—তদ্রূপ সাধকের যে ভাব বা স্বভাব তাহার পুরক ভাবটি দ্বারাই ঐ ভাবের পূর্ণতা আসে—উহাই তাহার ইষ্টভাব। ভাব জগতে সাধক শিশু বা সন্তান হইলে তাহার ইষ্ট হইবে তাহার মাতা বা পিতা বা এই জাতীয় কোন ভাবময় সত্ত্ব। প্রতি ভাবের মধ্যেই এই জাতীয় ব্যাপারটি রহিয়াছে। সাধক এবং সাধ্য একই ভূমিতে অবস্থিত থাকে। সদগুরু প্রদত্ত দীক্ষার পর অথবা বিনা দীক্ষাতেও যে কোন প্রকারে ভগবদনুগ্রহ ক্রিয়াশীল হইলে কুণ্ডলিনী জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ দেহ প্রকট হয়। কখনও ইষ্টদেহ প্রথমে অনুভূত হয়, পরে নিজ দেহ এবং কখনও প্রথমে নিজ দেহ অনুভূত হয়, পরে ইষ্টদেহ। বাস্তবিক পক্ষে দুইটি দেহ এক সঙ্গেই প্রকট হয়, তবে অভিব্যক্তির মধ্যে কালগত অগ্রপশ্চাৎ ভাব থাকে। সাধকের সাধনা এই অব্যক্ত ভাবকে অভিব্যক্ত করার জন্ত। গুরু দীক্ষা বা অনুগ্রহ দ্বারা যে আবরণ সরাইয়া দিয়াছেন সাধক নিজের প্রযত্ন অর্থাৎ সাধনা দ্বারা সাধারণতঃ তাহা সরাইতে পারে না। কিন্তু মূল আবরণ

গুরু কৃপাতে সরিয়া গেলেও বুদ্ধির আবরণ উপাসনা ব্যতীত যায় না। এইজন্য বুদ্ধির আবরণ না সরি পর্যন্ত সাধকের অনুভূতি আসিতে পারে না।

শব্দ ও অর্থ বস্তুতঃ একই সত্তার দুইটি দিক। বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিষয়ও মূলে একই। জপাদি দ্বারা কিংবা ধ্যানাদি দ্বারা অগ্রসর হইতে থাকিলে বাচ্য অর্থের দিক অথবা ধ্যেয় অর্থের দিক আবরণ হইতে মুক্ত হয়। তখন ইষ্ট অনাবৃত ভাবে সাধকের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশমান হয়। ইহাই মন্ত্রের দেবতা রূপে সাক্ষাৎকার অথবা ধ্যানের ধ্যেয়রূপে আত্মপ্রকাশ।

(৩)

ইষ্টমূর্তির সান্নিধ্য

কিন্তু ইষ্টমূর্তির আবির্ভাব হইলেও তাহাকে ততক্ষণ উপাসনা করা যায় না যতক্ষণ তাহা সন্নিহিত না হয়। সাধক ও ইষ্ট পরস্পর অভিযুথ না হইলে ইষ্টের সহিত সাধকের 'আমি-তুমি' ব্যবহার চলে না। এইজন্য আবির্ভাবের পর ইষ্ট যাহাতে সাধকের সন্নিহিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। বর্তমান স্থলে ভক্তিমূলক ভাব নাই। সেই জন্যই সান্নিধ্যের পর পূজার সূত্রপাত হয়। ব্যবধান না কাটিলে পূজা হইতে পারে না।

ইষ্টকে নিজের সন্নিহিত রূপে ভাবনা করা আবশ্যক। চিন্তের বৃত্তি একাগ্র হইলে দৃষ্টির সম্মুখে ধ্যেয় বিষয় ব্যতীত অন্য পদার্থ ভাসে না। তখন একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ই অতি উজ্জ্বল ভাবে

প্রকাশিত হয়। চারিদিকে অণু কিছু ভাসে না বলিয়া শূণ্যের প্রকাশ হয়—এই শূন্যই আকাশ। ইহাই হৃদয়াকাশ, কারণ বাহ্য আকাশ তখন থাকে না। বাহ্য আকাশে বায়ুর সংস্পর্শ বশতঃ ধোয়ের সহিত তদ্ভিন্ন অণু বহু বস্তুর প্রকাশ মিশ্রিত থাকিয়া যায়, কিন্তু হৃদয়াকাশে ধোয় ভিন্ন অণু কিছু দৃশ্য পদার্থ থাকিতে পারে না। কারণ চিত্তের একাগ্রতা লাভ ব্যতীত হৃদয়ে প্রবেশ হয় না। ঐ সময়ে বায়ু স্তম্ভিত থাকে এবং একমাত্র ধোয় বস্তুই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রূপে দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থিত প্রতীত হয়। ইহারই স্বচ্ছ আলোকে হৃদয়াকাশটি আলোকিত। এই আকাশটি বাস্তবিক পক্ষে হৃদয় কমলের কর্ণিকা ব্যতীত অপর কিছু নহে। এই আকাশে ইষ্টদেবতা সমাসীন রহিয়াছেন একরূপ ভাবনা করিতে হইবে। মানস পূজার প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে উপবিষ্ট রূপেই ভাবনা করা আবশ্যক। অবশ্য অবস্থা বিশেষে অণু প্রকারেও ভাবনা করা চলিতে পারে। সাধকের দৃষ্টি ইষ্টদেবতার দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত থাকিলে ভাল হয়। কারণ তাহা হইলে ইষ্টদেবতার ও সাধকের মধ্যে পরস্পর ভাবানুপ্রবেশ সম্ভবপর হয়। তখন ইষ্টের মুখচ্ছবি স্মিত হাস্তে সুশোভিত ও প্রসন্ন দেখা যায়। ভাবনা দ্বারা ধারণা করিতে হইবে আমার এই ইষ্ট রূপই মহাইষ্ট স্বরূপ, ইনিই সমগ্র বিশ্বের ইষ্ট, ইহারই রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিহিত রহিয়াছে। সমগ্র বিশ্ব ইহার দেহ স্বরূপ—অখোলোক বা পাতাল হইতে অথবা আরও নিম্নস্থ নিরয় হ্রদ ও কালাগ্নি ভুবন হইতে উর্দ্ধলোক বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত, এমন কি মায়াভীত স্তর সমূহের শিখরস্থ শিব ব্যোম পর্য্যন্ত

জগৎ এই ইষ্টমূর্তির দেহে পাদাদ্ভুষ্ঠ হইতে মস্তকের শিখাস্থান পর্য্যন্ত অঙ্গে বিরাজ করিতেছে। ইহার মূর্তি বিগুহ সঙ্গময় এবং চিদানন্দে উচ্ছলিত। ইনি যে কোন রূপধারী হউন না কেন মূলে সাধকের মাতৃরূপই এবং বিশ্ব জননীর সহিত অভিন্ন। ইনি চৈতন্যময়ী এবং চিংশক্তি, আনন্দশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির সম্মিলিত মূর্তি। সাধক ইহারই সন্তান, ইহা হইতে আবির্ভূত এবং ইহাতেই স্থিত ও ইহারই শক্তিতে শক্তিমান।

(৪)

ইষ্টপূজা—উপচার সমর্পণ

ইষ্টমূর্তি আবির্ভূত হওয়ার পর উপচার দ্বারা তাঁহাকে সেবা করিতে হয়। অপ্রকট দেবতার পূজা হয় না, প্রকট হলে পূজা চাই। মুখ্য উপচার পঞ্চবিধ মনে করা চলে। এই পঞ্চবিধ উপচার বস্তুতঃ নিজের স্থূল স্বরূপের বাহ্য প্রতীক মাত্র। গন্ধ পৃথিবী তত্ত্বের বাচক, পুষ্প আকাশতত্ত্বের বাচক, ধূপ বায়ু তত্ত্বের বাচক, দীপ তেজ তত্ত্বের বাচক এবং নৈবেদ্য রস বা জল তত্ত্বের বাচক। এই পঞ্চ তত্ত্ব দ্বারা সাধকের স্থূলদেহ রচিত হয়। পঞ্চতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত দেহে এবং বস্তুতে যথাক্রমে 'আমি' ও 'আমার' ভাবের উদয় হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব উপচার রূপে অর্পিত হইলে বুদ্ধিতে হইবে সাধকের অহংতা ও মমতা রূপ অভিমানের আলম্বন স্বরূপ সব কিছু ইষ্টে অর্পিত হইল—শুধু নিজ দেহ নয়, দেহ সংসৃষ্ট সমস্ত জগতই তাঁহাতে অর্পণ করা হইল। এই

প্রকার উপচার সমর্পণ সম্পন্ন হইলে তাহার ফলে ঐ সকল চিদানন্দময় ইষ্ট স্বরূপে একীভূত হয় বলিয়া চিদানন্দময় রূপ প্রাপ্ত হয় এবং ইষ্টের আশীর্বাদ স্বরূপ ঐ চিদানন্দ রূপ সাধকের নিকট ফিরিয়া আসে। তখন আরও অধিক মাত্রায় সাধকের দেহ শুদ্ধি ঘটে। এই প্রকারে সাধকের চিত্ত বা সূক্ষ্ম শরীর ইষ্টের স্বরূপে অর্পিত হইলে উহাও পূর্ববৎ চিদানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টদেবতার আশীর্বাদ রূপে শুদ্ধ স্বরূপ লইয়া সাধকের নিকট ফিরিয়া আসে। এই পর্য্যন্ত উপচার ফলে সাধকের দেহ শুদ্ধি ও চিত্ত শুদ্ধির অলৌকিক আপেক্ষিক উৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা গুরুদত্ত কার্যার বুদ্ধিকল্পিত আবরণের অপসারণ মাত্র। কারণ সাধক প্রথম হইতেই গুরুকৃপা বলে নিজেও ইষ্টের অনুরূপ শুদ্ধ সত্ত্বময় নির্মল দেহ সম্পন্ন। তাহা না হইলে তাহার পক্ষে ঠিক ঠিক ইষ্ট সেবা সম্ভবপর হইতে পারে না। ভাবনা রাখিতে হইবে যে সাধক ও ইষ্ট উভয়ই শুদ্ধ রূপ হইলেও একদিকে সাধকের অভাব যেমন ইষ্টের দ্বারা পূর্ণ হয়, অপর দিকে তেমনই ইষ্টেরও অভাব সাধক দ্বারা পূর্ণ হয়। তাই উভয়ের যোগ সম্পন্ন হইলে সাধকের দুর্বলতা কাটিয়া যায় এবং তাহার বলাধান হয়। ইষ্টও তখন সার্থক হন। তখন সাধক ইষ্টকে নিজের সহিত অভিন্ন রূপেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রাপ্তি যোগাত্মক। একবার এই যোগ লাভের পর বিয়োগ আর কখনই ঘটে না।

ইষ্টের সহিত নিজের সম্বন্ধ বিষয়ে তিনটি অবস্থা মোটামুটি

ভাবরাজ্যে উপলক্ষিত হয়। অবশ্য ইহা একদিকের কথা। আমি এখন একদিকের কথাই বলিতেছি। প্রথম অবস্থায় ভাব দৃষ্টিতে আমি ছোট তুমি বড়, তোমার প্রতি আমার যে ভাবের বিকাশ তাহাই ভক্তি। আমি তোমাকে মাতারূপে, পিতারূপে, গুরুরূপে, প্রভুরূপে ভক্তি করি। তাহার পর আমি আর তত ছোট নই এবং তুমিও আর তত বড় নও, দুইই সমান সমান। এই অবস্থায় যে ভাবের বিকাশ হয় তাহাই সখ্য শ্রীতি ইত্যাদি। এই স্থিতিতে আমিতে ও তুমিতে ব্যবধান থাকে না বলিয়া তুমিতে আমি প্রবিষ্ট হই এবং আমাতেও তুমি প্রবিষ্ট হও—সাধক ইষ্টে অনুপ্রবেশ করে পূর্ণরূপে এবং ইষ্টও তদ্বৎ সাধকে অনুপ্রবেশ করে। ইহার পর এই পরস্পর অনুপ্রবেশের ফলে একটি উচ্ছ্বাস জাগে বা একটি উদ্বেলিত অবস্থার উদয় হয়। তখন এই আমি তুমির মিলন ফল একটি রূপ ধরিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। এই বাহ্য রূপটি আমি-তুমি হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমি-তুমি হইতে নিম্নস্তরে প্রকাশ পায়। এইখানে যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহার নাম বাৎসল্য। কেহ কেহ ইহাকে করুণা বলিয়া গ্রহণ করে। পিতামাতা, গুরু ও প্রভু যে স্নেহের দৃষ্টিতে সন্তানকে শিষ্যকে বা আশ্রিতকে আন্তরিক নিরীক্ষণ করেন ইহা সেই দৃষ্টি। ইহার ফলে এই বাৎসল্যের পাত্র বিশ্বরূপ সন্তান শিষ্য বা আশ্রিত বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে। তখন আমি আর খণ্ড আমি থাকে না। সে খণ্ড আমি হইতে সকলের মহাসমষ্টিরূপে মহাআমি রূপ ধারণ করে। তখন যে আমি পূর্বে ধার-বিশেষে সন্তান ছিল এবং মাতৃ স্নেহের অধিকারী হইয়াছিল সে

স্বয়ংই মাতৃরূপে পরিণত হয়। এই মাতার বাহিরে আর কিছু নাই, সকলেই তাহার গর্ভে। ইহাই প্রকৃত মহাপ্রলয়ের দশা। অনন্ত তখন একের গর্ভে। মা তখন এই গর্ভস্থ আভাসকে নিজ সন্তার সঙ্গে অভেদে লালন করিয়া কোন মহাক্ষণে নিরাভাস মহাচৈতন্য রূপে স্থিতিলাভ করেন। অর্থাৎ সন্তানকে পাইলেই মা তখন আর মা না থাকিয়া পিতার স্থানে অর্থাৎ বিশ্বগুরু পরমশিব স্থানে উপবিষ্ট হন। ইহা এক ও অদ্বিতীয়। যখন সন্তান ভাব ছিল তখন সমস্ত বিশ্ব ও অনন্ত তাঁহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহাও এক, যখন মাতৃরূপ ধারণ হইল তখন সকল শক্তি তাহাতে আশ্রিত এবং সমগ্র বিশ্ব তাহাতে নিহিত। তাই তখনও এক। আর যখন সন্তানও নাই মাও নাই সবই মূল স্থানে বা বিশ্ব পিতার স্থানে একীভূত তখনও সেই এক। এই পর্য্যন্তই ভাবরাজ্য। এই মহাভাবেই ভাবের পরিসমাপ্তি। ইহার পরেই ভাবাতীত—ইহা পরের অবস্থা।

(৫)

উর্দ্ধ পথে যাত্রা উন্নতীর দিকে

বাহ্য ইষ্ট পূজার অবসানে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য সাকার ভাবের অবসান, নিরাকারে প্রবেশ। সাধক ও ইষ্ট তখন অভিন্ন। এই অভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া নিগূর্ণ বিশ্বগুরু ভাবের প্রথম স্ফুরণ ঘটে। সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর প্রকৃত উপাসনা চলে। মূলাধার হতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত চক্রময় ও কলাময়। আন্তর ইষ্ট পূজার অধিকার এই পর্য্যন্তই। আজ্ঞাভেদের সঙ্গে সঙ্গে

নিষ্কলের সূচনা আসে। একাগ্র ভূমি হইতে নিরোধ ভূমিতে প্রবেশ হয়। কলাযুক্ত দশা না থাকিলেও তার সংস্কারটা তখনও থাকে। তাই এই উর্দ্ধ মার্গ নিষ্কল হইলেও বিপুল নিষ্কল নহে—এখানে উভয়ের মিশ্রণ আছে। একাগ্র ভূমির পর নিরোধ ভূমির সূত্রপাত নিষ্কলের উন্মেষ হইতেই ধরিতে পারা যায়।

একাগ্র ভূমিতে ক্রমধ্যে সমগ্র মনটি পাওয়া যায়—ছড়ান মন নহে, সংহত ও গুটান মন। ভাবনা করিতে হইবে বিক্ষিপ্ত ভাব আর নাই এবং একাগ্রতার উদয় হইয়াছে। ধোয় বস্তুর আকার বা ভাব লইয়া মনই তখন প্রকাশমান হয়। এই প্রকাশই জ্ঞান বা প্রজ্ঞার স্বরূপ। বস্তুতঃ ইহা মনেরই বৃত্তি—তবে মন তখন একে আলম্বিত বলিয়া আর তাহাতে বিক্ষেপ নাই। অনন্ত মহাকাশে সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন একমাত্র সূর্য্যই দৃষ্ট হয়, ইহাও সেই রূপ। গুরুশক্তির প্রভাবে এই অবস্থাও অতিক্রান্ত হয় আজ্ঞাচক্র ভেদের সঙ্গে সঙ্গে। এক মাত্র মন ভাঙ্গিয়া তখন অর্ধমাত্রায় পরিণত হয়—মনের অতীত ভূমিতে যাওয়ার ইহাই প্রথম সূচনা। মন ও মস্ত্র অভিন্ন, মস্ত্র ও ইষ্টদেবতাও অভিন্ন। এবার একাগ্র মন ভাঙ্গিয়া ভগ্নাংশে পরিণত হইতেছে। ক্রমশঃ মনের বিকাশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ক্রম ধরিয়া চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এবার ইষ্টদেবতার স্বরূপের মধ্য দিয়া যেন নিগূর্ণ গুরু স্বরূপের প্রকাশ দৃষ্টিগত হইতেছে। ইষ্টদেবতা যে গুরু হইতে অভিন্ন, সগুণ সাকার যে নিগূর্ণ

নিরাকারেরই আত্মপ্রকাশ ইহা অবশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এইটি জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত তুরীয়ার সূচনা। অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত মহাকারণের সূচনা। এই রাস্তা ধরিয়াই কাল হইতে কালাতীতে সঞ্চারণ হয়। ক্রমধ্যে আজ্ঞা চক্রের মধ্যবিন্দুতে সমগ্র মনটিতে কালের পূর্ণ প্রকাশ। বাহ্য জগতে যাহা ত্রিকাল অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্তমান রূপে প্রকাশমান মন একাগ্র হইলে তাহা শুধু বর্তমান রূপে প্রকাশ পায়। তখন অতীত ও অনাগত আর পৃথক্ থাকে না—অনিরুদ্ধ প্রকাশ বর্তমানের মধ্যে বর্তমান রূপে নিজ সত্তা লইয়া প্রকাশিত হয়। দেশও তখন পৃথক্ পৃথক্ থাকে না। দেশগত অনন্ত ব্যবধান, দূর দূরান্তর ভাব, তখন কাটিয়া যায়। আজ্ঞার অন্তঃস্থ প্রজ্ঞার আলোকে অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল নিত্য বর্তমান ও সন্নিহিত রূপে ইষ্ট দেবতার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। ইষ্ট তখন শুধু বিশ্বের প্রতীক নহে, বিশ্বের आधारভূত অনন্তদেশ ও অনন্ত কালেরও প্রতীক। এক হিসাবে বলা যায়, সাধক তখন বিশ্বের কেন্দ্রে স্থিত হইয়াছে। আজ্ঞা চক্রের মধ্যবিন্দুই জগতের কেন্দ্র। কারণ ঐখান হইতেই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ হয়। ইষ্টের পূজার পরিসমাপ্তিতে ঐ বিশ্ব কেন্দ্রে ইষ্টের সত্তায় ও বলে সত্তা ও বল সম্পন্ন হইয়া স্থিতিলাভ করা যায়। জাগতিক ঐশ্বর্যের ইহাই পরমাশ্রয় স্থল।

কিন্তু এখানে থাকিলে ত চলিবে না। বিশ্বকে অতিক্রম করিতে হইবে। ইহাই সকল, সগুণ, সাকার হইতে নিষ্কল

নিগূর্ণ ও নিরাকারের দিকে যাত্রা । মনের এক মাত্রা ভাস্কিয়া
 অর্দ্ধ মাত্রার ক্রমে প্রবেশ করিবার ইহাই উদ্দেশ্য । স্বরূপতঃ
 গুরু নিগূর্ণ-নিরাকার, অথচ ইষ্ট সংযোগে অভিন্ন দৃষ্টিতে তিনিই
 আবার সগুণ সাকার । সর্ব প্রথম যে গুরু দর্শন তাহা এই
 সগুণ সাকার গুরু দর্শন । তারপর গুরুকৃপা লব্ধ মন্ত্র বা ইষ্টকে
 ফুটাইয়া তোলার কাজ চলে । তার ফলে মূঢ় ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত
 অবস্থা হতে মন একাগ্রতা লাভ করে—সঙ্গে প্রজ্ঞালোকের
 উদ্ভাসন হয় । ইহাই ইষ্ট সাক্ষাৎকার । এই অবস্থায় মন্ত্র
 দর্শন হয়, মন্ত্র ও দেবতার অভিন্নতা হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনেরও
 একাগ্রতা হয় । তাহার পর নিগূর্ণ গুরু স্বরূপের দিকে যাত্রা
 শুরু হয় । এই পথ ষট্চক্রের উপরের পথ, দিব্য অনুভূতির
 পথ । মনই শুদ্ধ চৈতন্যের আবরণ, যদিও জাগতিক দৃষ্টিতে
 মনই চৈতন্যের প্রকাশকও বটে, কারণ জগতের দিকে মনে
 প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই বৃত্তি-জ্ঞানরূপে পাওয়া যায় । বিক্ষিপ্ত
 অবস্থাতেও তাই, একাগ্র অবস্থাতেও তাই । বিশুদ্ধ চৈতন্যের
 অনুভূতিই দিব্য অনুভূতি—তার জন্ম মনের বাহিরে যাইতে
 হয় ।

এখানে দুইটি অবস্থা আছে । মনকে ভাস্কিতে ভাস্কিতে
 ক্রমশঃ ক্ষুদ্র করিতে হয় । যে অনুপাতে মনের মাত্রা কম হয়
 ঠিক সেই অনুপাতে দিব্য চৈতন্যের প্রকাশ মাত্রা অধিক হয় ।
 এইভাবে যতদূর সম্ভব মনের ভগ্নাংশ বাড়াইতে হয় । দ্বিতীয়
 সাপ্তাহের পর যে স্থিতি তাহাই বিন্দু—তখন মনের মাত্রা এক

না হয়ে আধা—অর্ধ মাত্রা। মন তখন ভাঙ্গিয়াছে—
ভাঙ্গিয়াছে বটে, কিন্তু অর্ধ মাত্রা। ঐ অর্ধ মাত্রায় মন বিশুদ্ধ
চৈতন্যকে এমন ভাবে প্রকাশ করে যেমনটা ইষ্ট সাক্ষাৎকার
বা একাগ্র ভূমিতে হইতে পারে নাই।

বলা বাহুল্য, এই রাস্তাটি শব্দময় বা নাদময়। অর্ধ মাত্রা
বা বিন্দু ভূমি হইতেই এই রাস্তার সূত্রপাত হয়। যেমন যেমন
মনের মাত্রা কমিতে থাকে তেমন তেমন অধিকতর উজ্জ্বল ভাবে
চৈতন্যের প্রকাশ বাড়িতে থাকে। ক্রমশা হইতে উর্দ্ধদিকে এই
মার্গ প্রসারিত—ইহা উন্মণীর দিকে ধাবিত হইয়াছে। স্থূল
কাল সাকার জগৎ অধিকার করিয়া আছে। বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র
অবস্থা স্থূলে কালের সহিত সংশ্লিষ্ট। নিরোধের মার্গে স্থূল কাল
নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম কালংশ থাকে। যেখানে মন সেখানেই
কাল। মন ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাই কালও ভাঙ্গিতে
ভাঙ্গিতে সূক্ষ্ম হইতেছে। নাদের ক্রমিক অগ্রগতিতে ইহা
ঘটে। নব নাদ পর্য্যন্ত নয়টি স্তর এই ভাবেই চলে। উন্মণীতে
গেলে কাল থাকে না—সমনীতেই কালের সূক্ষ্মতম পরমাণু ধরা
পড়ে। কেহ কেহ উন্মণী হইতেই এই কাল পরমাণুর সূত্রপাত
ধরেন। একাগ্র ভূমিতে কালের মাত্রা = ১। ইহা তাহার ৫১২
ভাগের এক ভাগ। বস্তুতঃ মন কাল নাদ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই
শেষ হয়। ইহা গুরুর অহেতুক মহাকুপা সাধ্য। বস্তুতঃ শেষ
হয় না, শেষ করিতে হয়। মনের বল যার যেখানে সমাপ্ত তার
সেখানেই মন-ভাঙ্গা প্রক্রিয়ার সমাপ্তি। বস্তুতঃ এই ভাঙ্গা

অনন্ত কাল চলিতে পারে। তাই এই রাজ্যের শেষ নাই। ইহাই সদানন্দময়ী যোগমায়ার রাজ্য বাহা নিত্য চিদালোকে আলোকিত। এখানে ভাঙ্গা মনের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র আছে। উজ্জ্বল চৈতন্য প্রকাশমান। ইহা অনন্ত বটে—পূর্ণতার দিকে নিরন্তর গতিশীল, কিন্তু পূর্ণ নহে।

পূর্ণে ক্ষীণতম ভাবেও কাল, মন প্রভৃতির খেলা থাকে না।

(৬)

শ্রীগুরুর পরম স্বরূপ নিগূর্ণ ও নিষ্কল

যোগমায়ার অধিকার শুদ্ধ মনো রাজ্য পর্য্যন্ত। উন্নয়নে গেলে বিশুদ্ধ নিষ্কল পদের প্রকাশ হয়। ইহাই শ্রীগুরুর পরম স্বরূপ—নিগূর্ণ ও নিরাকার। ইহা মনের অতীত স্থিতি। এইখানেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। গুরু স্থানে না গেলে আত্মাকে চিনাইবে কে? এখানেও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ইহাই তৃতীয় ও চরম প্রণাম। ইহার পরই স্বরূপ স্থিতি।

(৭)

আত্মস্বরূপ অখণ্ড—পূর্ণ সত্য

আত্মাই স্বয়ম্—পূর্ণ আত্মস্বরূপ—অখণ্ড পূর্ণ সত্য। তাহা সগুণ সাকারের অতীত, নিগূর্ণ নিরাকারেরও অতীত। আবার তাহাই একাধারে সগুণ নিগূর্ণ, সাকার নিরাকার, সক্রিয় নিষ্ক্রিয় এবং সং অসং। উহাই পরম স্থিতি।

পথে থাকা পর্য্যন্ত এই সব ভাবনারই ব্যাপার। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ভাবনার অতীত। বুদ্ধি দ্বারা ইহা ধরা যায় না। অধরাকে কে ধরিতে পারে যদি সে দয়া করিয়া ধরা না দেয়? সর্বত্রই একটা ক্রম আছে, কিন্তু কোথাও আসল বন্ধন নাই, কারণ যে কোন ক্ষণে অক্রম সত্তা ফুটিয়া উঠিতে পারে।

নিষ্কলের প্রথম সূচনা বিন্দুতে। পূর্ণ নিষ্কল = মহাবিন্দু। ইহাই অখণ্ডের আসন। কারণ অখণ্ড সকল, সকল-মিশ্র নিষ্কল ও শুদ্ধ নিষ্কলেরও অতীত অখচ সর্বময়। তাহাই পূর্ণ সত্য।

আশ্রম গৌরব

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

বিশুদ্ধ কানন সহ সিদ্ধাসন

নবমুণ্ডী যার নাম,

এই আমি জানি, এই শুধু চিনি,—

এই মোর কাশীধাম ।

যোঁগৈশ্বর্য য়ার আছিল অপার

তঁারই পরমাণু-চয়

ইহার বাতাসে অবিরত ভাসে

মন যাতে গুদ্র রয় ।

মূর্তিটি তাঁর জ্ঞান গরিমার,

চিত্রে মধুর হাসি*

যেন রে সতত রয়েছে বিতত,

দেখিতে ছুটিয়া আসি ।

কত পুষ্প রাজি নানা বর্ণে সাজি'

দেবতা চরণ তরে

বিধ ও তুলসী— পত্র সহ মিশি'

যাবে চলি শ্রীমন্দিরে ।

* এখানে শ্রীশ্রীগুরুদেবের মন্দির মূর্তি ও তৈল চিত্রের কথা হইতেছে ।

❖ ❖ ❖

এখানে প্রার্থনা অপূর্ণ রহে না
 দেখা গেছে বার বার
 নাম যে অপর্ণা অপগত-ঋণ।
 পূজা ভোগ ঋণ তাঁর ।*

ইহার তুলনা জগতে মিলে না
 এ অতি অপূর্ব ঠাঁই ।
 যোগীর মহিমা নাহি যার সীমা
 তারই পরিচয় পাই ।

অপর্ণার্নৈ নমস্তভ্যাম্ অভয়ান্নৈ নমো নমঃ ।
 নবমুণ্ডী প্রতিষ্ঠান্নৈ মহাদেবায়ৈ সদা নমঃ ॥

*

*

*

বিশুদ্ধ কাননে প্রতি পর্ব দিনে
 কুমারী সেবন রীতি :
 শতেক কুমারী বসি সারি সারি
 সেবা নেন এথা নিতি ।

* অপগত ঋণ যার তিনিই অপর্ণা ; (অপ + ঋণ, স্ত্রীলিঙ্গে আ) এখানে
 পূজা ভোগ প্রার্থনা যা তাঁর ঋণ বলিয়া গণ্য করেন এবং অচিরে শোধ
 করেন ।

অতি সমাদরে নানা উপচারে
 আপ্যায়িতা খান বসি' ;
 ভোজনের পরে সিকি* বাম করে
 পেয়ে মুখে ফোটে হাসি ।

দেবীর প্রতিমা সব কুমারী মা
 গুরু মুখে শুনা আছে,
 কস্মীরা তাই সতর্ক সদাই
 ক্রটি কিছু ঘটে পাছে ।

সধবা বিধবা কুমার কত বা
 অনাহুত এসে পড়ে
 নিরাশ হইয়া যায় না ফিরিয়া
 বসিয়া ভোজন করে ।

নৈমিত্তিক ছাড়ি নিত্য কুমারী—
 একটির সেবা হয়,
 শুদ্ধ আচারে শুদ্ধ উপচারে
 সিকিটিও বাদ নয় ।

*

*

*

*দক্ষিণারূপে প্রতি কুমারীকে একটি সিকি দেওয়ার রীতিই এখানে প্রচলিত । ঐ সিকিটির লোভে কোনও কোনও ব্রাহ্মণ মহিলা হৃদ্বপোষ্য কন্যাকে বৃকে লইয়া আসেন ।

বৃহস্পতি সম জ্ঞানে অনুপম
 স্থির প্রজ্ঞ কবিরাজ
 মধ্যো মধ্যো আসি আশ্রমেতে বসি
 দেখেন ইহার কাজ ।

কর্ম নাশক নামে সম্পাদক
 কর্তব্যোতে অতদ্রিত,
 সতত ব্যাপৃত করিতে উন্নত
 আশ্রমের দশা দ্রুত ।

নিত্য কুমারী সেবা অধিকারী
 ব্রহ্মচারী একজন
 ছিলেন এখানে ; এবে অন্য জনে
 সে কাজে দিয়েছে মন ।

* * *

দীন জন তরে আছে একধারে
 দাতব্য চিকিৎসালয়,
 সযত্নে সেখানে সব রোগিগণে
 ঔষধ দেওয়া হয় ।

* * *

কর্ম হেথা যত সব সুসংঘত,
 ভাব সদা নিরমল ;
 দলাদলি নাই, রেষারেষি নাই,
 নাই কোন কোলাহল ।

যোগীর আস্তানা এটি, আছে জানা
 তত্বচিত আচরণ
 সদা শুদ্ধ ভাবে করে থাকে সবে
 সুনিয়ত বাক্য মন ।

স্বার্থের মায়া নাহি ফেলে ছায়া
 ভারপ্রাপ্ত কোন জনে,
 লুটে খাইবার পুঁটুলি বাঁধার
 কুবুদ্ধি জাগে না মনে ।

গুরুর মহিমা আশ্রম গরিমা
 ম্লান যাতে নাহি হয়,
 সেই আশা মনে পুষি সর্ব্বক্ষণে,
 বলি—“জয় গুরু জয় ।”

শ্রীগুরু-প্রসঙ্গ *

স্বরেশচন্দ্র সিংহ শর্মা

স্বধর্মের দীক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা যখন আমার চিত্তে অঙ্কুরিত হয় তখন আমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুলীগঞ্জে। সে সময়ে ঢাকায় এক বোবা ও কালা ব্রহ্মচারীবংশী যুবকের সহিত পরিচয় হয়। তাঁহাকে কাগজে লিখিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে এবং তিনি কাগজে লিখিয়া জবাব দিতেন। তিনি আমাকে বলেন যে শীঘ্র আমাকে দক্ষিণাভিমুখে বদলি হইতে হইবে এবং আমার জীবনে মহাপুরুষ লাভ হইবে। চিত্ত আমার তখন বিষয় মদিরা পানে মত্ত, দশদিক ঐহিক সুখের কুহেলী জালে আচ্ছন্ন। জীবনে কি উপায়ে মহাপুরুষের কৃপালাভ হইবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বংশ-গুরু ত্যাগ করিয়া অন্ত্র সদ্গুরু আবেষণ করা সম্পর্কে মনে নানা প্রকার বিভীষিকার সৃষ্টি হইল। অব্বেষণ করিয়াই বা সংসারে এ সম্পদ কোথায় পাইব? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আমি মনে করিলাম আমার কোনো চেষ্টা অনাবশ্যক। এ জীবনে যদি সময় হয় তবে মহাপুরুষই আমাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁর পাদপদ্মে স্থান দিবেন।

*এই প্রবন্ধটি বহুদিন পূর্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুদানন্দ প্রসঙ্গ নামে কথার ভিত্তিতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন প্রকাশ সম্ভব হয় নাই। দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হইল।
—সম্পাদক।

এমন সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁরে গভর্ণমেন্ট আমাকে শিয়ালদহ পুলিশকোর্টে বদলি করিলেন। এ কাজের জন্য প্রায় দুই শতের অধিক কর্মচারী প্রার্থী হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন। আমি এ বিষয়ে কিছুই জানিতাম না এবং আবেদন নিবেদনও কিছু করি নাই। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে শিয়ালদহ কার্যভার গ্রহণ করিলাম। সেখানে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। ইনি একটি ত্যাগী গৃহস্থ। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিশেষ ভক্ত এবং দারিদ্র্য ব্রত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া সে সময় জ্ঞান ভক্তির চর্চা করিতেন। ইহার সংসঙ্গ প্রভাবে আমার চিত্তে স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজকার্যের অবকাশে প্রতি রবিবারে গিয়া রাজেন্দ্র বাবুর সহিত ধর্মালোচনা করিয়া আনন্দ লাভ করিতাম। এমন সময় শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন দত্ত সাবডিপুট ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে একদিন তান্ত্রিক জ্যোতির্বিদ কালীবাবুর নিকট লইয়া যান। ইনি কলেজ স্ট্রীটে থাকেন। তিনি আমার হাত দেখিয়া বলেন যে বৎসরের মধ্যে আমার কোন মহাপুরুষের অনুগ্রহ লাভ ঘটিবে। মনে করিলাম রাজেন্দ্রবাবুর সাহায্যেই আমার সে শুভাদৃষ্ট সফল হইবে।

১৯২৫ সাল কাটিয়া গেল। ১৯২৬ সালে হঠাৎ শ্রীগুরুদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র খাঁর নিকট হইতে হঠাৎ একখানা পত্র পাইলাম। তিনি তখন খুলনার কোর্ট ইন্সপেক্টর ও আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। আমি মুর্শিদাবাদ

জেলায় অন্তর্গত লালবাগ থাকার সময়ে ইনি সেখানে কোট সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। সে সময় তিনি তাঁহার বর্ধমানের গুরুর কথা আমাকে অনেক সময় বলিতেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমার কোন কৌতূহল হয় নাই। পত্রালাপ শুরু হইবার পর শরৎবাবু আমাকে লিখিলেন, তাঁহার গুরু কলিকাতায়। তিনি শীঘ্র তাঁর চরণ দর্শন লালসায় কলিকাতা আসিবেন এবং আমি ইচ্ছা করিলে তিনি আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবেন। আমার চিন্তে যে স্বধর্মের জন্য তীব্র পিপাসা জাগিয়াছে পত্রালাপের ভিতরে তাহার আভাস তাঁহাকে দিয়াছিলাম।

যথাসময়ে শরৎবাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ভবানীপুর ২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ১৯২৬ সালের গ্রীষ্মকাল। গিয়া দেখিলাম এক ঘর মানুষ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে আর তন্তুপোষের উপর শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত এক দীর্ঘকায় বিরাট পুরুষ গৈরিক বাস পরিধান করিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছেন। একটি প্রকাণ্ড দণ্ডের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বরফের চাপ বাঁধা পাশে একটি ইলেকট্রিক টেবিল-পাখা জোরে চলিতেছিল। বরফ গলিয়া নিম্নে একটি পাত্রে পড়িতেছিল। তাহাতে ঈষৎ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন কক্ষটি অনেকটা স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সেই আমার প্রথম দর্শন। সে যুঁতি দেখিয়া ভীতিপূর্ণ বিশ্বয়ে আমার চিত্ত পূর্ণ হইল। এমন

শিবতুল্য মূর্তি জীবনে ত আর দেখা হয় নাই। মনে হইল, অসাধারণ ব্যক্তি, কিন্তু ধরা দিলাম না। সুতরাং দর্শনান্তে আবার রীতিমত প্রতি রবিবারে রাজেন্দ্র বাবুর নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু মন হইতে শ্রীগুরুর মূর্তি মুছিল না। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র খাঁ মহাশয় খুলনা হইতে শিয়ালদহ পুলিশকোর্টে বদলি হইয়া আসিলেন। অপূর্ব যোগাযোগ। তিনি আসার পর তাঁহার সঙ্গে প্রতি রবিবারে ২০ নং রূপ নারায়ণ নন্দন লেনে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু চিত্ত তখনও রাজেন্দ্র বাবুর দিকেই আকৃষ্ট। যে দিন রবিবারে দুপ্রহরে ২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনে যাইতাম সেদিন সকালেই রাজেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ সারিয়া আসিতাম। এইভাবে একদিন সকালে রাজেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করিয়া দুপুর বেলা ২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনে শরৎবাবুর সঙ্গে উপস্থিত হইলাম। শ্রীগুরুর কথামৃত পান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতে লাগিলাম। স্মটিক যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যবিজ্ঞানের নানা খেলা দেখিতে লাগিলাম। সেদিন হঠাৎ এক সময়ে এক অভূতপূর্ব রসে আত্মহারা হইয়া শ্রীগুরুর নিকট দীক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। বংশগুরু সম্বন্ধে আমার মনের ভ্রম তখনও দূর হয় নাই। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কুলগুরু ত্যাগে প্রত্যবায় আছে কিনা? বাবা বলিলেন,—“দীক্ষার পূর্বে ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইবে? যাহার নিজের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে এবং যিনি সেই শক্তি শিষ্যের চিত্তে জাগ্রত করিতে সক্ষম তিনিই কুলগুরু।

তোমার বাবার মাষ্টারের মুখ সন্তান নিরেট, উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার শিক্ষকের উপযুক্ত না-ও হইতে পারেন।” আমি বলিলাম,—“কে আমার ইষ্টদেবতা দীক্ষার পূর্বে কি তাঁহাকে আমায় দেখাইয়া দিতে পারেন?” তিনি বলিলেন—“নিশ্চয়, কিন্তু নিজের ক্রিয়ায় ইষ্টদর্শন লাভ না করিলে, আমার দর্শিত মূর্তিতে তোমার ইষ্টজ্ঞান হইবে না—ভোজবাজি বলিয়া বোধ হইবে।” কথার শক্তিতে মনের ঘোর কাটিয়া গেলে আমি বাবাকে পুনরায় কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“বাবা, আমার কি কোন উপায় হইবে না?” শ্রীগুরু উত্তর করিলেন,—“কেন হইবে না?” এই বলিয়া সহস্র গম্ভীর মূর্তিতে তাঁহার পার্শ্বস্থ একখানা খাতা হাতে তুলিয়া লইয়া তাহার ভিতরে অঙ্কিত একটি কুণ্ডলী দেখাইয়া বলিলেন,—“এই দেখ, তোমার জন্ম কুণ্ডলী আমি পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছি। তবে দীক্ষার কিছু বিলম্ব আছে। তোমার মন এখন দুইদিকে ঘুরিতেছে কিনা! সময়ে সব হবে।”

বাস্তবিক সাময়িক উত্তেজনা বশে তখন বাবার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেও সে সময়ে আমার চিত্ত স্থির হয় নাই। দীক্ষা কি এখানেই হইবে কি রাজেন্দ্র বাবুর সাহায্যে হইবে সে সম্বন্ধে আমার মনে ষথেষ্ট দ্বিধা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আমার এ বিভিন্নমুখী মনের দ্বন্দ্বের কথা সে সময়ে আমি ব্যতীত আর কোন মনুষ্যের জ্ঞানগোচর ছিল না।

ইহার পর রথযাত্রার উপলক্ষে শ্রীগুরুদেব পুরীর আশ্রমে

চলিয়া গেলেন। তিনি পুরীতে চলিয়া যাওয়ার পর আমার মন তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিবার জন্য একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। তাঁহার কলিকাতা ফিরিয়া আসার কাল পর্য্যন্ত আর ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে না পারিয়া আমি দীক্ষা প্রার্থী ও শরণাগত হইয়া পুরীর ঠিকানায় পত্র লিখিলাম। শ্রীগুরুদেব পুরী বিগ্গুদ্বানন্দ ধাম হইতে ৫ই শ্রাবণ উত্তর দিলেন, “আমরা ৭ই শ্রাবণ শুক্রবার এখান হইতে রওনা হইয়া ৮ই শ্রাবণ শনিবার ভবানীপুরে যাইব। সেখানে যাইয়া (দীক্ষার) দিন স্থির করিব। কোন বিষয়ে চিন্তার কারণ দেখি না। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে।”

শ্রীগুরুর পত্র পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। তখন স্ত্রীর নিকট আমার দীক্ষার বিষয় সমুদয় প্রকাশ করিলাম। তাহাকে বলিলাম, “স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে শ্রীগুরুর নিকট দীক্ষালাভ না করিলে, সংসার ধর্ম্ম পালনে নানা অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। স্ত্রী বংশগুরু ত্যাগ করিতে সহসা রাজি হইলেন না! আমি তাঁহাকে বলিলাম, এমত অবস্থায় আমাকে একাকীই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সে মহাপুরুষের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ অন্তে কর্তব্য স্থির করিতে বাধা কি?” আমার এ প্রস্তাবে স্ত্রী সন্মত হইলেন। বাবা পুরী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে স্ত্রীকে লইয়া শ্রীগুরুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সহিত আমার স্ত্রীর কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা জানি না। কিন্তু দর্শনান্তে স্ত্রী আমাকে আসিয়া বলিলেন, তিনি আমার সহিত শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

ভাদ্র মাসে স্বামী শ্রীর দীক্ষা নিৰ্ব্বিলম্বে শেষ হইয়া গেল। ইহার পর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর উৎসবে ধোগদান করিবার জন্য বর্দ্ধমান যাই। উৎসবান্তে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সেই দিনই আমরা কলিকাতা ফিরিয়া আসি। লোকাল ট্রেনে শ্রীগুরুদেব দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় এবং আমরা তাঁহারই পাশের মধ্যম শ্রেণীর কামরায় যাত্রা করি। বর্দ্ধমান হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত যতক্ষণ গাড়ী চলিতেছিল ততক্ষণ আমি শ্রীগুরুদেবের অঙ্গ নিঃসৃত তীব্র পদ্মগন্ধে নিমজ্জিত ছিলাম। যেন পদ্মগন্ধে ভাসিতে ভাসিতে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

ইহার কিছুদিন পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র খাঁ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম শ্রীগুরুদেব পর দিবস তাঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত জীবনধন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বেলঘরিয়াস্থিত বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন এবং তাঁহার উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীকে সেখানে বাইয়া প্রসাদ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এ সংবাদ যখন আমার ক্রটিগোচর হইল, তখন আমি সন্দিগ্ধে পীড়িত। বেলঘরিয়া যাইবার আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি মনের আগ্রহে শরৎবাবুকে বলিয়া দিলাম কাল সকালে যদি জ্বর ত্যাগ হয় তবে বেলঘরিয়া যাইতে চেষ্টা করিব। ঠিক বলিতে পারি না। তবে শিয়ালদহ ট্রেন ধরিবার পথে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া যাইবেন। পরদিন জ্বর ত্যাগ হইল না। যথাসময়ে শরৎবাবু উপস্থিত হইলেন। আমি জ্বর লইয়াই তাঁহার সঙ্গী হইলাম। বেলঘরিয়াতে কেবল শ্রীগুরুর প্রসাদ

নয়, ভুরিভোজন করিয়া ফেলিলাম—পোলাও, মৎস্য, দধি, অমূল, মিষ্টান্ন, সন্দেশ ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর তাগ। সুস্থ শরীরে দ্বিপ্রহরের ট্রেনে শিয়ালদহ ফিরিলাম। জ্বরের একরূপ পথা ও ঔষধ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। তাঁহার শক্তিতে যাহা সম্ভব তাহা অসম্ভব হয়, এবং যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভব হয়। ইহার সংখ্যাভীত দৃষ্টান্ত ও শ্রীগুরুদেবের সকল শিক্ষিত শিষ্যগণই বিশেষ ভাবে অবগত আছেন।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে শ্রীগুরুদেব যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন প্রতি রবিবারে ও ছুটির দিনেই আমার ভাগ্যে শ্রীগুরুদেবের চরণ দর্শন ঘটিত। সপ্তাহের অন্ত্যান্ত দিনে গুরুতর রাজকার্যের চাপে আমার ভাগ্যে গুরু দর্শন প্রায়ই ঘটিত না। ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্য কার্যে অবহেলা করিয়া গুরু-দর্শন সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেব আমাকে কখনও উৎসাহ দেন নাই। অথচ গুরুদর্শন লালসায় আকণ্ঠ তৃষিত হইয়া থাকিতাম। এই সময় শিয়ালদহ পুলিশকোর্টে যখন তখন যেখানে সেখানে শ্রীগুরুর অঙ্গ নিঃসৃত সুমধুর পদ্মগন্ধ আত্মাণ করিয়া বিভোর হইতে লাগিলাম। শিয়ালদহ পুলিশকোর্টের এক অংশেই আমার বাসস্থান ছিল। ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে পদ্মগন্ধ। তেতলার কামরায় টেবিলের উপর রায় লিখিতে লিখিতে পদ্মগন্ধ আসিয়া আমার কর্শের উত্তেজনা শিথিল করিয়া দিত। মনের ভ্রান্তি মনে করিয়া লেখা বন্ধ করিয়া কলম তুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছি, তবুও পদ্মগন্ধ। আমি ঘরের সমুদয় কপাট বন্ধ করিয়া

দিয়া 'রায়' লিখিতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছি, আবার পদ্মগন্ধ !
 এমনি ভাবে পদ্মগন্ধের চেটে বহিতে লাগিল । ইহার পর
 একদিন আমার স্ত্রীর আঙ্গিক সমাপনান্তে আমি আঙ্গিক ঘরে
 প্রবেশ করি । ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আমি কাঠের পার্টিসন
 দেওয়া বারান্দা দিয়া আমার তেতলার কাজ করিবার ঘরের
 দিকে যাইতেছি । এমন সময় সুমধুর পদ্মগন্ধ আমাকে
 অভিনন্দন করিল । আমি সে সুমধুর অঙ্গ গন্ধ নাসিকা পথে
 গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ চিত্তে আমার স্ত্রীকে আহ্বান করিলাম । তিনি
 গৃহান্তর হইতে তথায় উপস্থিত হইলে সে সুগন্ধির কথা
 বলিলাম । তিনি প্রফুল্ল হইয়া আমাকে বলিলেন, “দেখিবেন ত
 আশুন ।” এই বলিয়া তিনি আঙ্গিকের ঘরের দিকে চলিলেন ।
 আমি তাঁহার অনুগমন করিলাম । আমরা উভয়েই আঙ্গিকের
 ঘরে প্রবেশ করিলাম । আঙ্গিকের ঘরের পূর্বদিকের প্রাচীরে
 শ্রীগুরুদেবের ছবি পশ্চিমাশ্রয় করিয়া লটকান ছিল । আমার
 স্ত্রী বলিলেন, “ছবির পশ্চাৎ ভাগে যাইয়া দেখুন ।” আমি
 ছবির পশ্চাৎ ভাগে নাসিকা আরোপ করিয়া দেখিলাম, সে
 স্থান হইতে ভুরভুর করিয়া শ্রীগুরুর পদ্মগন্ধি অঙ্গ সৌরভ
 উথলিতেছে ! এই ঘটনাগুলি অপর কয়েকটি গুরুত্ববাহকের
 নিকট প্রকাশ করার পর হইতে সুগন্ধের উৎস একেবারে বাদ
 হইয়া যায় ।

আমাদের শিয়ালদহস্থিত বাড়ীতে আর একদিন একটি
 আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল । আমার স্ত্রী একদিন সন্ধ্যাবেলা

সূর্যাস্তের পর আছিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন শ্রীগুরুদেব স্বয়ং যোগদণ্ডের নিকট উপবিষ্ট। এ আশ্চর্য্য ও অপ্রত্যাশিত দর্শনের জন্য আমার স্ত্রী প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভীতিবিচলিত চিন্তে আছিকের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন। পরে প্রদীপ জালিয়া লইয়া পুনরায় আছিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন সে মূর্ত্তি ততক্ষণ অন্তর্দ্বান করিয়াছে। আমার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া আমার নিকট এ ঘটনা প্রকাশ করিলেন। অবশ্য শ্রীগুরুকে অন্যত্র সশরীরে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য এ পর্য্যন্ত আমার নিজের ঘটে নাই।

ইহা ব্যতীত আশ্রমে সূর্য্যবিজ্ঞানের বলে ফটিক ধস্তের সাহায্যে সূর্য্যাকিরণ হইতে পাথরের উপর সত্ত্বঃ প্রফুটিত সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভ সঞ্চার করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঐ যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যাকিরণ ফোকাস করিয়া পাথর কাদার মত গলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। পাথরের রং বদলাইয়া অন্য রং হইতে দেখিয়াছি। তুলায় খসখস, চন্দন, গোলাপ, চামেলী, জুঁই প্রভৃতির সুগন্ধ সঞ্চারিত হইতে দেখিয়াছি। একদিন সূর্য্যাকিরণ হইতে কপূর বর্ষণ হইতে দেখিয়াছি। পানের খিলির সুপারির কুচিকে জীবন্ত কীটে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। আর একদিন সূর্য্যাকিরণ হইতে এক গামলা আইসক্রিম তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সে সুমিষ্ট নেবুর সুগন্ধিযুক্ত বরফচূর্ণ নিষ্মিত আইসক্রিম নিজে খাইয়াছি। আর একদিন বরাহনগর ঢোল মহাশয়ের বাড়ীতে ফটিক ধস্তের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল হস্ত

সঞ্চালন দ্বারা জাফরাণযুক্ত রূপালি মোড়কযুক্ত দানাদার জর্দা বায়ুমণ্ডল হইতে আকর্ষণ করিতে দেখিয়াছি। আর একদিন রূপনারায়ণ নন্দন লেনে কাচের পাত্রে কাঁচাগোল্লা সন্দেশ নির্মিত হইয়াছিল। আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম না। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র খাঁ মহাশয় আমাকে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া বলিলেন। ইহার পর শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করিতে গিয়া কথা প্রসঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন,—“হাঁ, কাঁচাগোল্লা তৈয়ারী হইয়াছিল বটে। তা সে কাচ পাত্রটি নিয়ে এসো—সুরেশকে একটু সন্দেশ দেই।” একজন গুরুভাই যিনি সেদিনকার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, সেদিন যে সন্দেশ তৈয়ারী হইয়াছিল, সে সব টুকুই শিষ্যগণের মধ্যে তখনই বিতরিত হইয়া গিয়াছিল,—পাত্রাবশিষ্ট আর কিছু ছিল না। বাবাজি তাঁহাকে সেই পাত্রটি তাঁহার সম্মুখে আনিবার জ্ঞাপন আদেশ করিলেন। আমাদের গুরুভাই যখন পাত্রটি শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন দেখা গেল, কাচ পাত্রটিতে সেদিন যে পরিমাণ কাঁচাগোল্লা তৈয়ারী করা হইয়াছিল, সেই পরিমাণ কাঁচাগোল্লাই তাহাতে মজুত আছে। আমরা অনেকেই সে কাঁচাগোল্লা খাইলাম। সাধারণ কাঁচাগোল্লার মতই আশ্বাদ, তবে তফাৎ এই যে উহাতে তীব্র গোলাপের সৌরভ মিশ্রিত ছিল। যাহা সচরাচর এরূপ খাণ্ডে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা ব্যতীত কেবল হস্ত সঞ্চালনে মৌরী বাতাসে উড়াইয়া দিয়া ঠিক সেই জিনিষ কেবল হস্ত সঞ্চালনে বায়ুমণ্ডল হইতে পুনরুদ্ধার করিতে দেখিয়াছি। শূন্য কৌটা পান

১২৬

বিশুদ্ধবানী

[অষ্টম

মসল্লায় ভরিয়া উঠিয়া আবার অন্তর্দ্বান হইতে দেখিয়াছি।
এবং একটি লোহার গুলি নেপথ্যালিনের গুলিতে ইচ্ছামাত্র অঙ্গুলি
ঘর্ষণে পরিবর্তিত হইতে দেখিয়াছি।

জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণত্বলাভ-একটি দৃষ্টি

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মের আশ্রয় শাস্ত্র ধর্ম্মেরও একটি অন্তরঙ্গ ও একটি বহিরঙ্গ দিক আছে এবং এই উভয় দিকের অন্তরালে একটি মধ্য বিভাগও আছে। শুধু তাহাই নহে যাহা সাধনা নামে পরিচিত তাহা প্রতি দিকেই আছে। অন্তরঙ্গ সাধনাতে যেমন সাধক ও সাধ্য আছে বহিরঙ্গ সাধনাতে ও তেমনি সাধক ও সাধ্য আছে। স্বভাবমূলক অধিকার অনুসারে সাধনার পথ নির্দিষ্ট হয়। তাই সাধক মাত্রই পথিক কিন্তু সকলের পথ এক প্রকার নহে। ইহা ছাড়া প্রতি বিভাগেই প্রাকৃতিক নিয়মে দৃষ্টিগত বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। এইজন্য অন্তরঙ্গ সাধনাতেও যেমন প্রকারগত ভেদ আছে, বহিরঙ্গ সাধনাতেও তেমনি আছে। ইহার মূল কারণ “রুচীনাং বৈচিত্র্যাং” মনুষ্যের রুচিগত বৈচিত্র্য। তাই প্রকৃতি ভেদে লক্ষ্যেরও ভেদ হয় এবং মার্গেরও ভেদ হয়। কিন্তু রুচিনিরপেক্ষ অথও দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বলিতে হইবে পরমার্থতা লক্ষ্য এক ভিন্ন দুই নহে। কিন্তু সামর্থ্য ভেদ বশতঃ রুচিরও অধিকারের ভেদ হয় বলিয়া পথও নানারূপে প্রতিভাত হয়। বর্তমান প্রবন্ধ আমরা অন্তরঙ্গ শক্তির একটি প্রকারের কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

সর্বপ্রথমে লক্ষ্য অথবা মহাশক্তির স্বরূপটি বিবেচ্য। এই স্বরূপের দুইটি দিক আছে। একদিক হইতে দেখিতে গেলে ইহা পরম প্রকাশময়, নিরপেক্ষ আত্মস্বরূপ মাত্র, অপরিচ্ছিন্ন সত্তাস্বরূপ এবং অখণ্ড অনন্ত ভাবমাত্র। কিন্তু তাহাতে কিছুই প্রতিভাত হইতেছে না—যেন চিদাত্মক একটি অনন্ত দর্পণ পড়িয়া রহিয়াছে, যাহাতে কোন চিত্র ভাসমান হইতেছে না। শুধু যেন দর্পণই আছে নিজেই নিজে আর কিছুই নাই। ইহাই নিরাভাস চৈতন্য—বিশ্বাতীত চিং সত্তা। ইহাকে কোন কোন আচার্য্য অখণ্ড অনন্ত সত্তা সমুদ্রে শুধু চিংকলার প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কলা যেন কলাতীতের সহিত এক হইয়া স্থিত রহিয়াছে। ইহাই পরম সাক্ষি স্বরূপ, ইহা স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা।

নিজেকেই নিজে দেখিতেছে। ভিন্ন দৃশ্য কিছুই নাই। ইহা কলা হইলেও অস্পন্দ এবং শক্তি হইলেও শিবস্বরূপ। কলাতীত সত্তা চিং কলাকে কখনও ত্যাগ করে না। যদি করে বলিয়া স্বীকার করা যায় তখন ঐ কলাতীত অচিং বলিয়া অসৎ বা অসৎকল্পরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই চিং কলা স্পন্দহীন হইলেও অচিন্ত্যরূপে স্পন্দনশীল। চিংকলার এই স্পন্দন-শীলতাই মহাশক্তির অপর একটি দিক। এই স্পন্দনের প্রভাবে ইহাতে নিরন্তর সঙ্কোচ ও প্রসার নামক দুইটি ব্যাপার চলিতেছে। যেমন কলাতীতটি সত্য, চিংকলা তাহার নিত্য সাথী তেমনি চিংকলাটিও সত্য সঙ্কোচ-প্রসার তাহার নিত্য সাথী। পক্ষান্তরে ইহাও বলা যায় যে সঙ্কোচ প্রসারটি সত্য, চিংকলা

তাহার নিত্য সাথী। একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। চিংকলাটি অমৃতকলা, সঙ্কোচ প্রসারটি তাহাকে আশ্রয় করিয়া কলনাত্মক কালের খেলারূপে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু কলনাত্মক কাল ব্যতীত কলনহীন মহাকালের একটি পরমরূপ আছে—তাহা কাল হইয়াও কাল নহে এবং কাল না হইয়াও কাল।

সঙ্কোচ প্রসারের মূলে রহিয়াছে চিংকলার স্বাতন্ত্র্যময়ী লীলা—এইটি তাহার স্বভাব। চিংকলা যখন প্রসৃত হয় তখন তাহাতে আভাস ফোটে। প্রসারের যেটি পূর্ণতা তদনুরূপ প্রসারময় সমগ্র বিশ্ব তাহাতে ভাসিয়া উঠে। এই প্রসার ক্রমশঃ হয় এবং অক্রমে একই ক্ষণে ঘটিয়া থাকে—উভয়ই সম্ভব। অক্রম স্থলে চিদদর্পণে পূর্ণ আভাস বিद्यমান থাকে। শাক্তগণ ইহাকে বলেন মহাসৃষ্টি। ইহা খণ্ড সৃষ্টি নহে, ক্রমশাক্তি সম্পন্ন কালের ক্রমিক সৃষ্টি নহে, ইহা মহাকালের মহাসৃষ্টি। বস্তুতঃ ইহা সৃষ্টি হইয়াও সৃষ্টি নহে—নিত্য বর্তমান। ইহা চিং হইতে পৃথক কিছু নহে, চিংএর আভাস দিকটা বিশ্বাত্মক ও নিরাভাস দিকটা বিশ্বাতীত। বস্তুতঃ নিরাভাস চিতে নিরাভাস দশাতেও নিত্য সাতাভাস দশা বিद्यমান থাকে। তাই ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ—নিত্য নিগুণ হইয়াও নিত্য সগুণ এবং নিত্য নিরাকার হইয়াও নিত্য সাকার। চিদরূপা মহাশক্তিতে বিশ্ব ভাসিতেছে ইহাও সত্য, অথচ ভাসিতেছে না ইহাও সত্য। ইহা একটি প্রাহেলিকা।

যাহাতে আমরা সৃষ্টি ও সংহার বলি তাহা কালের খেলা

তাই ক্রমযুক্ত, কিন্তু ইহা পরিচ্ছিন্ন প্রমাতার নিকট, স্বরূপতঃ নহে। চিৎকলাযুক্ত শিব পর প্রমাতা, পরিচ্ছিন্ন বা খণ্ড প্রমাতা নহে। পরপ্রমাতা প্রকাশ ও বিমর্শের মিলিতরূপ বলিয়া পূর্ণ অহং—পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী। কলাতীত ও চিৎকলা একই সঙ্গে অভিন্ন স্বরূপে অবস্থিত—তাহাতে চিৎকলা অস্পন্দ হইলেও নিরন্তর স্পন্দন লীলাশীল,—তাহার অহংএর মধ্যে অনন্ত শক্তির সমাহার রহিয়াছে।

যখন পরপ্রমাতা অপরিচ্ছিন্ন থাকিয়াই স্বেচ্ছাবশতঃ খেলাচ্ছলে নিজেকে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রদর্শন করে তখন ঐ পরিচ্ছিন্ন অহংএর সম্মুখে তাহার প্রতিযোগী রূপে ইদংএর প্রতিভাস হয়। এই প্রতিভাসে ক্রম থাকে। কারণ ইহা কালকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। ইহাকে এক হিসাবে আত্মার self-alienation বলা চলে। আত্মা তখন নিজেই নিজের পর হইয়া যান—ইহাই পর প্রমাতার সর্বপ্রথম সঙ্কোচ গ্রহণ এবং তাহার ফলে চিদগুণাবের প্রাপ্তি। এই চিদগুণই পরিচ্ছিন্ন প্রমাতা, মায়া প্রমাতা, খণ্ড অহং, আদিম অহং, আদি জীব প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার সম্মুখে ইদম্-রূপে সর্বপ্রথম যাহা প্রকাশিত হয় তাহা শূন্য বা আকাশ। ইহাকে কেহ কেহ চিদাকাশ রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তবে ইহা যে চিদাকাশ নহে তাহা সত্য। পূর্বে যে মহাশক্তি কথ্য বলা হইয়াছে, যাহা চিৎ সত্তাতে দর্পণস্থ প্রতিবিশ্ব বৎ প্রতিভাসমান হয় ও যাহার নাশ নাই, ইহা তাহাই। নিরাভাস চৈতন্য দশাতে তাহার উপলব্ধি হয়

না। এই আভাস রূপী বিশ্বের দর্শন যখন অভেদে সম্বাচিত হয় তখন উহাই কাহারও কাহারও নিকট ভগবদ্দর্শনরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা অভেদ সর্বজ্ঞত্বের অবস্থা। কিন্তু এই দর্শন ভেদেও হইতে পারে। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন, যোগবাশিষ্ঠে বর্ণিত লীলার বিশ্ব দর্শন, Dante এর Divine Comedy তে বর্ণিত Sempiternal Rose এর দর্শন—এই সবই ভেদ সৃষ্টির দর্শন মাত্র, ইহা মহাসৃষ্টির দর্শন নহে।

আত্মা হইতে ভিন্নরূপে জগতের দর্শন পরিমিত প্রমাতার দর্শন, পরপ্রমাতার দর্শন নহে। পরপ্রমাতা সমগ্র বিশ্বকে নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে, আত্মস্থ প্রতিবিশ্বরূপে, দর্শন করিয়া থাকে। অণুভাবের সঙ্গে সঙ্গে চিৎ মহামায়াতে ঘুমাইয়া পড়ে—ইহারই নামান্তর কালরাজ্যে প্রবেশ। কালের দৃষ্টিতে ইহাই অনাদি সুষুপ্তি। ইহা অনাদি হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহার মূলে আছে আত্মার স্বাতন্ত্র্যমূলক সঙ্কোচ গ্রহণ। এই সুষুপ্তির পর জাগরণ হয় অবরোহ ক্রমে মায়্যভেদের পর। তখন চিদগুণেচরী চক্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মিতপ্রমাতা সাজে অর্থাৎ অল্পজ্ঞ, অল্পকর্তা, দেশাবচ্ছিন্ন, কালাবচ্ছিন্ন ও সর্বদা অভাববোধের দ্বারা ক্লিষ্ট প্রতীত হয়। আত্মস্বরূপের অখ্যাতি বা অজ্ঞান মহামায়ারূপে বর্ণিত হয়। পশুভাব বা জীবভাব তাহার পরে ঘটিয়া থাকে। পরাবাক্ এই আদি জীবকে মহাসৃষ্টি মূলক খণ্ড খণ্ড অর্থ প্রদর্শন করে। এইগুলি বিকল্প ও ক্ষণস্থায়ী—নিরন্তর চিত্তক্ষেত্রে ইহার আসে ও যায়। বেদান্তশাস্ত্রে ইহারাই অবিচ্ছিন্ন বিক্ষেপবৃত্তি।

ইহার পর আসে কৰ্ম্ম, তখন দেহও দৃষ্টিগোচর হয়। অণু তাহাতে প্রবেশ করে। দেহ কৰ্ম্মসৃষ্ট। ক্রটিতে আছে, “তৎসৃষ্ট। তদেবানুপ্রাবিশৎ।” প্রথমে ছিল আত্মাতে অনানু-
 ভাব বা ইদম্-ভাব, তাহার পর হয় দেহে অহংভাব বা অনানুভাতে
 আনুভাব। ইহার মূলে আছে শব্দ, বর্ণশক্তি ও বর্ণমালার খেলা।
 পঞ্চমী ভূমিতে অবরোহ কালে আত্মাতে অনানু ভাবের সূচনা
 হয়, মধ্যমাতে সূক্ষ্ম প্রবেশ হয় ও বৈখরীতে স্থূলভাবের উদয়
 হয়। তখন ভৌতিক দেহে আমিত্বের উদয় হয়। এইবার প্রথমে
 বাহ্য জগতের দর্শন হয়। এই যে বাহ্য জগত বা পূর্বোক্ত মহাসৃষ্টির
 একদেশ ইহা দেহাবচ্ছিন্ন অহমের বহিস্পৃথী দৃষ্টির সম্মুখে
 ভাসিতে থাকে। ইহারই নাম পতন। ইহা আত্মার পঞ্চকুতা-
 কারিণী পঞ্চশক্তির অন্তর্গত তিরোধান শক্তির চরম ফল।

এইবার বিষয়টি পুনরালোচনা প্রসঙ্গে পরিস্ফুটভাবে সংক্ষেপে
 বর্ণনা করিতেছি। মূলে পরমশিব—তখন বিশ্ব তাহার সহিত
 অভিন্ন। তাহার পর স্বাতন্ত্র্যমূলে আণব ভাব প্রাপ্তি। ইহা অণুর
 সুপ্তাবস্থা। এইটি মহামায়া বা স্বরূপাখ্যাতি। প্রচলিত ভাষায়
 ইহাই কুণ্ডলিনীর সুপ্তি। ইহার পর মায়াম্পর্শে সুপ্তি ভেদ ও
 জাগ্রত ভাবের উদয়। এই সময়ে চিত্তের আবির্ভাব হয় এবং
 স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে বিশ্বের বোধ হয় ও মায়িক
 কণ্ঠকের সম্বন্ধ ঘটে। মহান্ ও অণু ভাব এই অবস্থায় ফুটিয়া
 উঠে। মহান্ সমগ্র বিশ্ব দেখিতে পায়, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। অণু
 বিশ্বের কিঞ্চিৎ অংশ দেখিতে পায়, তাহাও ভিন্ন ভাবে। এই
 সময়ে বিকল্পের উদয় হয়—ক্ষণে ক্ষণে নব নব উন্মেষ ফুটিয়া উঠে।

এই নাটকের সূত্রধার রূপে পরাবাক্ সব কিছু দেখাইয়া থাকে। মিত প্রমাতা উহা দেখিয়া মুগ্ধ হয়। ইহার পর ঐ শব্দই নাদরূপে প্রকাশ পায়। তখন সর্বত্র আকাশই আকাশ। তাহার পর ঐ নাদ খণ্ডিত হইয়া বর্ণমালারূপে প্রতিভাত হয়। দেহ রচনার ইহাই সময়। মায়া'র পর কর্মের সূচনা এইখান হইতেই হয়। সহস্রারে সমষ্টি বর্ণ থাকে অহংরূপে, নীচে থাকে ছড়ান রূপে চক্রে চাক্র। এইখানে অহং নাই, অহংকার আছে। সহস্রার সহস্র দল অর্থাৎ অনন্ত দল, তাহাতে অনন্ত বর্ণ আছে। কেন্দ্রে আছে শিরশক্তি। প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ দল আছে। তাহাতে নিজ নিজ চক্রের বিস্তার হয়। মধ্যমা হতে বর্ণ আরম্ভ হয়, কিন্তু অস্পষ্ট। বৈখরী ভূমিতে বর্ণ স্পষ্ট হয়। মনুষ্য দেহ বর্ণে পরিপূর্ণ। সব কিছু রচনার মূলে বর্ণ। কলন, সংকল্প, বৃত্তি, ভাব, সংস্কার, বাসনা, স্বভাব, সব কিছুই বর্ণমূলক, সর্বত্রই বক্রবায়ুর খেলা। এইগুলি শুদ্ধ বর্ণ নহে। সহস্রার বর্ণ শুদ্ধ, কারণ সেখানে বায়ুর বক্রতা নাই। যেখানে বর্ণ সেখানেই রাজ্য—প্রবেশ করিলে ভিতরে পাওয়া যায় নাদ, কেন্দ্রে পাওয়া যায় বিন্দু। বিন্দু ভেদ করিলে মহাপ্রকাশ।

সহস্রারেও চতুর্দিকেই বর্ণ। কেন্দ্রের পথে মহানাদ বা পরনাদ এবং কেন্দ্রে আছে বিন্দু। এই বিন্দুই ব্রহ্মবিন্দু—ভগবদ্ধামের কেন্দ্র, ভগবদ্ধামটি অভিন্ন বিশ্ব। মাতৃগর্ভে দেহ রচনা হয় বর্ণের দ্বারা অর্থাৎ প্রণবের দ্বারা বা রশ্মির দ্বারা। জীব বস্তুতঃ নিজ দেহ নিজেই রচনা করে, পরে তাহাতে অহংবোধ

করিয়া বদ্ধ হইয়া পড়ে। স্কুলদৃষ্টিতে এই অহংবোধের সূত্রপাত হয় প্রসবের পরেই, প্রাথমিক শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। ইহাই দেহাঙ্গবোধের রহস্য।

শাক্ত দৃষ্টিতে অনাত্মাতে আত্মবোধের মূলে বর্ণ অথবা অশুদ্ধ মাতৃকার ক্রিয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আত্মাতে আত্মবোধ অথবা অহংবোধের মূলে শুদ্ধ মাতৃকার ক্রিয়া রহিয়াছে। আত্মাতে যে আত্মবোধ হয় তাহা ঐ শুদ্ধ মাতৃকার প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। যাহাকে ভগবানের স্বাতন্ত্র্য শক্তির খেলা বলা হয় ইহাই তাহার স্বরূপ।

অবতরণের ক্রম আছে (আবার নাইও)। তবে এটা বৌদ্ধ ক্রম, কালগত ক্রম নহে কিংবা দেশগত ক্রমও নহে। অবতরণ সময়ে এই ক্রম সাধারণতঃ অলক্ষিত থাকে এবং উত্থানের সময় উহা লক্ষিত হয়।

প্রথমে ক্ষুরিত হয় জ্ঞাতা বা প্রমাতা, তাহার পর জ্ঞান বা প্রমাণ এবং সর্ব্বশেষে জ্ঞেয় বা প্রমেয়। পরমেশ্বর অবশ্য পরম প্রমাতা, সর্ব্ব জ্ঞাতা। সেখানে তাঁহার জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ এবং জ্ঞানে ভাসমান জ্ঞেয় নিত্যসিদ্ধ। বস্তুতঃ সেখানে তিনটিই অভিন্ন বা এক। এইটি পরশিবাবস্থাতে ভগবানের বিশ্বাত্মক স্থিতি। ভগবানের যেটি বিশ্বাতীত স্থিতি, তাহাকেই সাধারণতঃ নিগুণ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ঐ নিগুণ বিশ্বাতীত স্থিতি হইতে সমগ্র সৃষ্টি প্রপঞ্চ অনির্বচনীয় মায়া খেলারূপে প্রতীত

হয়। তাই ইহা মিথ্যা বা বিবর্তমাত্র। ব্রহ্ম কর্তা নহেন, মান্বিক প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান মাত্র। এই সৃষ্টিতে ঈশ্বর আছেন, জীব আছে, জগত আছে, আর আছে কাল, কৰ্ম, অবিজ্ঞা প্রভৃতি প্রবাহরূপে। ব্রহ্মে কিছুই নাই, অথচ মায়া বশতঃ তাঁতে সব কিছুই ভাসিয়া থাকে। কিন্তু বিশ্বাত্মক পরমশিবের অভিন্ন ভাবে বিশ্বও সর্বদাই থাকে। স্বাতন্ত্র্য বশতঃ উহা তাহা হইতে পৃথক্ ভাবেও তাহাতে ভাসিতে পারে। যাহা কিছু ভাসে তাহা তাহাতে অভিন্ন ভাবে সদাই ভাসে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হইলে উহা পৃথক্ ভাবেও ভাসিতে পারে। ইহাই সৃষ্টির রহস্য। ইহা মিথ্যা নহে, কারণ তাহাতে অভিন্ন ভাবে ইহা সদা বিद्यমান। তাই বলা হয় সমগ্র বিশ্ব শক্তিরূপে তাঁহার সঙ্গে অভিন্ন, তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্ট বা বিসৃষ্ট হয় মাত্র। যাহা তাঁহাতে ভাসে না তাহার ক্ষুরণ পৃথক্ ভাবেও হইতে পারে না।

এই যে অবতরণের ক্রম বলা হইল ইহাতে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে স্বতন্ত্র চিতিই বিশ্বসিদ্ধির হেতু। শক্তি সূত্রকারও তাহাই বলিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে সকলের আদিতে অর্থাৎ ত্রিপটুরূপ বিশ্ব রচনার প্রাক্কালে যাহা বিद्यমান তাহা প্রমিতি বা সংবিৎ। প্রথমে এই পূর্ণ সংবিৎ বা চিৎশক্তি হইতে খণ্ড প্রমাতা বা চিদগুর উদয় হয়। ইহা জ্ঞানহীন ও জ্ঞেয়হীন জ্ঞাতার মূলস্বরূপ। তাহার পর ঐ জ্ঞাতা হইতে জ্ঞানের উদয় হয়। তখনকার স্থিতি জ্ঞাতা ও উহার জ্ঞান। এই জ্ঞান অভেদাত্মক (বর্ণ), তাহার পর ভেদাভেদাত্মক (মন্ত্র) ও

অন্তে ভেদাত্মক (পদ), এই তিন প্রকারই জানিতে হইবে । এই বর্ণরূপ অভেদ জ্ঞান ও পূর্বোক্ত সংবিৎ স্বরূপ ঠিক এক নহে । মন্ত্ররূপ জ্ঞানে জ্ঞেয়ের ভান থাকে । ইহা অভেদে ভেদের উন্মেষ জানিতে হইবে । পদরূপ জ্ঞানে ভেদের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে উহাও জ্ঞানই, যদিও উহা জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে । ইহার পর জ্ঞানের অবসানে অজ্ঞানের মধ্যে ক্রিয়াশক্তির খেলা আরম্ভ হয় । তখন শুধু জ্ঞেয়মাত্র থাকে, জ্ঞান থাকে না । ইহাই হইল তত্ত্ব মতে বাচক অধ্বা হইতে বাচ্য অধ্বায় প্রবেশ । ক্রিয়াশক্তি কলন' রূপে জ্ঞেয়রূপী জ্ঞানকে বাহির করিয়া দেয়, ইহারই নাম অর্থসৃষ্টি বা Matter এর আবির্ভাব । ইহারও প্রগতির ক্রম আছে । প্রথমে কলনের প্রভাবে কলার আবির্ভাব হয়, পরে কলা হইতে তত্ত্বের আবির্ভাব হয় ও অন্তে তত্ত্ব হইতে ভুবনের আবির্ভাব হয় । এইখানেই অর্থের অবসান ঘটে । ইহাই অল্প কথায় জগতের স্বরূপ আলোচনা ।

আরোহ ক্রমটি ইহার ঠিক বিপরীত । অবতরণ ক্রমটি জীব জানিতে পারে না, কিন্তু উদ্ধারের ক্রমটি জানিতে পারে । ইহা হইতে বুঝিতে পারা গেল ভগবানের তিরোধান শক্তিই তাঁহার আত্মসঙ্কোচ সম্পাদন করিয়া থাকে । প্রচলিত ভাষায় ইহাই কুণ্ডলিনীর সৃষ্টি । এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ইহার উর্দ্ধ প্রাপ্ত হইল অণুভাবের উদয় এবং আত্মাতে অনানুভাবের ক্ষুরণ । ইহার অধঃ প্রাপ্ত হইল অনানুভাবে আত্মভাবের

উন্মেষ । মানুষ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষুটভাবে হইলেও দেহে অহংবোধ অনুভব করিতে আরম্ভ করে, ইহাই অহংকার । দেহই তখন অহং, দৃষ্টি তখন বহির্শুখী এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অহংরূপী আত্মা বাহ্য জগত অনুভব করিয়া থাকে । দেহাভিমানী বলিয়া জগতকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুভব করে । এই অনুভব ভোগরূপ । ইহাই বাহ্য জগতের সৃষ্টি । এই বাহ্য জগত এক হিসাবে জীবের নিজ সৃষ্টি । যতদিন এই জগতকে নিজের অন্তর্গত রূপে দর্পণে দৃশ্যমান নগরীর ন্যায় দেখিতে না পারিবে ততদিন সে পতিতই আছে এবং পতিতই থাকিবে । যত দীর্ঘকাল লাগুক এবং যত লোক লোকান্তরেই সে সঞ্চরণ করুক, সে বাস্তবিক পক্ষে পতিতই, তাহাতে সন্দেহ নাই । শুভকর্মের ফলে লোক লোকান্তরে ষাইয়া ভোগ ঐশ্বর্যা লাভ করিলেও সে পতিতই । সদগুরুর অনুগ্রহ বাতীত তাহার উদ্ধার সম্ভব নহে ।

আত্মা যখন জীব সাজিয়া পতিত হয় তখন প্রতি স্তরেই ভগবৎ শক্তি তাহার পতিত অবস্থার অনুরূপ সাহায্য করে অর্থাৎ ভগবৎ শক্তি তাহার প্রতিকূল ভাবে কার্য্য করে । বাস্তবিক পক্ষে আত্মার নিজ শক্তিই আত্মাকে মোহিত করিয়া রাখে । এইগুলি চক্ররূপে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে । কতকগুলি শক্তি, যাহাদিগকে খেচরীশক্তি বলা হয়, খেচরী চক্ররূপে আবর্তিত হইয়া তাহাকে মিত প্রমাতারূপে পরিণত করে । দিক্চরী শক্তি সকল দিক্চরী চক্র নামে আবর্তিত হইয়া তাহার

অন্তঃকরণ রূপে প্রস্ফুরিত হয়। তদ্রূপ গোচরী শক্তিগুলি গোচরীচক্র নাম ধারণ করিয়া তাহার ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়। এবং ভূচরী শক্তি ভূচরীচক্র নামে তাহাকে দেহের মধ্যে অহংরূপে আবদ্ধ করে। বিশাল ও অনন্ত মুক্ত সত্তাতে অহং প্রতীতির উদয় ভূচরী চক্রের দ্বারা প্রতিকূদ্ধ হয়।

এইভাবে জীব যখন পাশবদ্ধ তখন “dumb driven cattle” এর মতন হয় বলিয়া পশু পদবাচ্য হয়। এই পশুরূপী জীবের তখনকার অনুভূতি কি প্রকার? এই প্রকার বদ্ধ পশু জগতকে নিজ সত্তা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে এবং ভিন্ন দেখে। শুধু তাহাই নহে। সর্বত্র একটা নিয়তভাবে তাহার মধ্যে থাকে, যাহাকে শান্ত আচার্য্যগণ বিকল্প বলিয়া নির্দেশ করেন। যেমন একটি ফুল দেখিয়া যখন উহাকে ফুলরূপে গ্রহণ করি অর্থাৎ উহা যে ফুল অথ কিছুর নহে, এরূপে উহাকে গ্রহণ করি, তখন বুঝিতে হইবে আমাদের এই দর্শনটি একটি বিকল্প মাত্র। এই যে নিয়ত রূপে অবধারণ—এটা ফুল, কিন্তু পাতা নহে, ফলও নহে এবং অপর কিছু নহে, ইহাই বিকল্প। সর্বত্রই নাম জাতি প্রভৃতির যোজনা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা ফুল নয়, ইহাতে সব কিছু আছে অর্থাৎ “সর্বং সর্বাশ্চকম্” ভাবে ইহাকে গ্রহণ করা—ইহাই নির্বিবকল্প দর্শন। বদ্ধ জীব নাম, জাতি, আকার প্রভৃতির যোজনা বিরহিত রূপে কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। যদি পারিত তাহা হইলে এই নিয়ন্ত্রণ থাকিত না এবং যে কোন স্থানে, যে কোন ক্ষণে, যে কোন সত্তার গ্রহণ তাহার পক্ষে সম্ভব হইত।

অবতরণের পথে জীবরূপী অণু অনেকের অধিকার ভুক্ত হয়। প্রথমেই বিন্দুস্থিত শিবের অধিকার ভুক্ত হয়। এই শিব অনাশ্রিত শিব। ইহার কলে ক্রমশঃ আত্মার অণুভাব প্রাপ্তি, মহামায়ার আশ্রয় গ্রহণ এবং স্বরূপের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে। ইহার পর ঐ সঙ্কুচিত আত্মা বা অণু মায়াদ্বিষ্টতা ঈশ্বরের অধিকার ভুক্ত হয়। তিনি অণুকে মায়ায়ুক্ত করেন অর্থাৎ ঘটকধ্বকের আবরণে আচ্ছন্ন করেন। এই কঙ্কুকিত আত্মা তাহার পর ব্রহ্মার অধিকার ভুক্ত হয় এবং তাঁহা হইতে দেহযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, কঙ্কুক আবরণে আবৃত হইয়া আত্মা অনাদি অনন্ত কর্ম সংস্কারের মধ্য দিয়া গুণরাজ্যে প্রবেশ করে। গুণরাজ্যে রজোগুণ-অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা তাহাকে সংস্কারানুরূপ প্রাকৃত দেহ দান করেন। এই স্থানের ব্যাপার অত্যন্ত রহস্যময়। কালাতীত সত্তা হইতে কালরাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা স্বরূপতঃ সাক্ষিমাত্র হইয়াও কর্তৃত্ব অভিমান যুক্ত হয়। কর্ম প্রবাহ অনাদি। আত্মা মায়াম্পর্শের পর কাল ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অনাদি কর্ম সংস্কারযুক্ত রূপে অবস্থান করে। বস্তুতঃ প্রকৃতির গুণ হইতেই কর্ম সম্পাদন হইলেও অব্যবহিক নিবন্ধন অহংকার মোহে মূঢ় হইয়া আত্মা নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে। বলা বাহুল্য, ইহা পরিচ্ছিন্ন কর্তৃত্ব, যাহার মূলে কলা ও অশুদ্ধ বিদ্যা রহিয়াছে। দেহপ্রাপ্তির পর যতদিন দেহের অবসান না হয় অর্থাৎ দেহের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সে বিষ্ণুর অধিকার ভুক্ত হয়। বিষ্ণু প্রাকৃত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা। ইহার পর দেহসংহার ব্যাপারে মৃত্যুকালে সে

রূপের অধিকার ভুক্ত হয়। এইভাবে মলের পরিপাক না হওয়া পর্যন্ত অণুরূপী জীবাত্মা বা পশু, গৃহ্য হইতে জন্ম ও জন্ম হইতে গৃহ্য এই ক্রম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাদি ত্রিদেবের আশ্রয়ে সংস্কার করিতে থাকে। সংস্কার কালে কস্মানুসারে অধঃ, উর্দ্ধ ও মধ্য ত্রিবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মলপাক যতদিন সুসম্পন্ন না হয় ততদিন এইভাবে তাহার ভবচক্রে আবর্তন ঘটিয়া থাকে। মলপাক হইলেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহশক্তি তাহাতে সংস্কারিত হয়। তখন সে জগদগুরু সদাশিবের অধিকারভুক্ত হয়। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে শুদ্ধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ মার্গে আরোহণ করিতে করিতে অনাশ্রিত শিবতত্ত্ব ভেদ করিয়া পূর্ণ পরমেশ্বর বা পরমশিব অবস্থায় স্থিতিলাভ করে।

*

*

*

(২ ক)

আত্মা পূর্বোক্ত প্রণালীতে জীবতাব পরিগ্রহ পূর্বক অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া অনাদি কালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ইহাই তাহার পতন। আত্মা বাস্তবিক পক্ষে দেশ ও কালের অতীত। তাই কখন যে সে এই স্রোতে পতিত হইয়াছে, তাহা মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু পতিত হওয়ার পর যদি সে দৃষ্টি উন্মীলন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সে দেখিতে পায় ইহা একটি অনাদি প্রবাহ। অবেষণ করিয়াও ইহার আদি সে সন্ধান করিতে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক পক্ষে জীবের পতন কাল ও অকালের সন্ধির ব্যাপার। বস্তুতঃ কাল স্রোত হইতে মুক্তিলাভও ঐরূপই ব্যাপার।

জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজ শক্তির অধীন হইয়া পড়ে এবং দেহ ইন্দ্রিয়যুক্ত অবস্থায় কৰ্ম্মানুসারে সমগ্র মায়িক জগতে সঞ্চরণ করে। মায়িক জগতে অর্থাৎ মায়াগুণের মধ্যে অসংখ্য প্রকৃতাণ্ড রহিয়াছে এবং প্রতি প্রকৃতাণ্ডে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে—এ সবই জীবের ভ্রমণ ক্ষেত্র। উত্থান পতন নিরন্তর হইতে থাকে। কিন্তু ইহার কোন মূল্য নাই। কারণ জীব উর্দ্ধলোকে গেলেও যে পতিত সেই পতিতই থাকে। উর্দ্ধগতি হয় কৰ্ম্মানুসারে, কৰ্ম্মানুসারে অধোগতিও হয়। সূতরাং এই উর্দ্ধগতি অথবা অধোগতি প্রভাবে জীব স্বরূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। জীবের প্রকৃত উৎকর্ষ লাভের সূচনা ঠিক তখনই বলিতে হইবে যখন জীব জীবভাব হইতে নির্মুক্ত হইয়া নিজের নিত্যসিদ্ধ শিব স্বরূপের সন্ধান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহা ভগবৎ অনুগ্রহরূপ শুদ্ধ বিচার উদয় ভিন্ন হইতে পারে না। শুদ্ধ বিচার উদয়ের ফলে জীব এই বিরাট বিকল্প জালের বন্ধন হইতে চিরমুক্ত হইয়া নিবিবকল্প পরমপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীব যখন পরমপদে স্থান লাভ করে তখন সে জীবসৃষ্টি ও ঈশ্বরসৃষ্টি উভয় হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ বিকল্প শূণ্য আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করে। জীব সৃষ্টিতে প্রতি জীবের জগত ভিন্ন ভিন্ন বাসনা ও কল্পনার দ্বারা রচিত। নাম জাতি প্রভৃতি যোজনায় ফলে জীবের জ্ঞান বিকল্পময়, এবং এই বিকল্পের উপরে জাগতিক ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত।

যখন শ্রীগুরু কৃপায় শুদ্ধ বিচার সঞ্চার হয় তখন জীবের

দৃষ্টি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকে । শুদ্ধ বিজ্ঞা বলিতে ইহাই বুঝায় যে গুরু অনুগ্রহ পূর্বক জ্ঞানাজ্ঞান শলাকা দ্বারা শিষ্যের তিমিরাচ্ছন্ন দৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দেন । কোলগণ বলেন যে সমগ্র সৃষ্টির মূলে যে পরম বোধ-সমুদ্র রহিয়াছে তাহার নাম অকূল । এই অকূলে তরঙ্গ বা উন্মেষ উন্মেষই অনুগ্রহ নামে পরিচিত । এই তরঙ্গটি স্পন্দাত্মক । অকূল সমুদ্রে যখন প্রথম স্পন্দনের উদয় হয় তখন ঐ স্পন্দন অনুগ্রহের বিষয়ভূত জীবকে স্পর্শ করে । ঐ স্পন্দ চিৎশক্তির বিকাশাত্মক । জীবের অজ্ঞানমূলক বিকল্প-দৃষ্টির উপর যখন এই চিদ-উন্মেষ আঘাত পতিত হয় তখন জীবের সত্তাতে পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয় । সর্বপ্রথম ঐ উন্মেষ প্রাপ্ত চিৎশক্তি কালকে গ্রাস করিয়া প্রবৃত্ত হয় । কাল-গ্রাস সম্পন্ন হইলেই জীবের দৃষ্টি হইতে বিকল্প জাল ক্রমশঃ কাটিতে আরম্ভ করে । এই প্রক্রিয়ার ক্রমিক বিবর্তনে সর্ব-প্রথম প্রমেয় শোধিত হয় । প্রমেয় শুদ্ধির ফলে আত্মার আধ্যাত্মিক জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হয় । ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—“বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরী-তুলাং নিজান্তর্গতম্” অর্থাৎ নগর যে প্রকার দর্পণে দৃষ্ট হয় তদ্রূপ বিশ্বও আত্মাতে নগর প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিবিস্তৃত দৃষ্ট হয় । তথাপি “মায়ায়া বহিরিবোদ্ধৃতং” অর্থাৎ মায়া বশতঃ বাহ্যবৎ প্রতীত হয় । এই প্রতীতি সত্য নহে, মায়া কাটিয়া গেলে অথবা কাটিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র বিশ্বকে আত্মা নিজের মধ্যেই অনুভব করিয়া থাকে । এই যে বাহ্যবৎ আভাস ইহা পূর্ববর্ণিত প্রমেয় শুদ্ধির ফলে থাকে না । দেহাশ্রবোধ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া

ভাগ] জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণজ্বলাভ-একটি দৃষ্টি ১৪৩

আত্মা ভ্রমবশতঃ মনে করে যে বিশ্ব তাহার বাহিরে আছে, দেহাভ্যবোধ কাটিয়া গেলে বাস্তবিক পক্ষে বাহির বলিয়া কিছু থাকে না। বিশ্ব তখনও থাকে, কিন্তু বাহিরে নয়, অন্তরে। শুদ্ধ বিজ্ঞা বা জাগ্রত চিৎশক্তি বুঝুক। তাহা প্রথমে বিশ্বগ্রাস করিবার জন্য উন্মুখ হয়। তাহা বহিস্থুথ হইয়া বিশ্বকে ভিতরে লইয়া আসে। বিসর্গ দ্বারা বিশ্ব বিসৃষ্ট হইয়াছে, এবার বিন্দু তাহাকে নিজের মধ্যে টানিয়া লয়। সংবিৎ বিষয় গ্রহণ করিয়া যখন তৃপ্ত হয় তখন আর বিষয় ভোগ ক্রিয়া থাকে না। জ্ঞানটা রাগাত্মক হয় এবং স্বাত্মরূপে সাক্ষাৎকৃত হয়। এই স্থিতিটি কি প্রকার তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। তখন অর্থাৎ গ্রাহ-গ্রাহক ভাবের অবস্থান কালেও পরাশক্তি বিষয়ভোগ বা রাগকে নির্বিকল্পক ভাবে অনুভব করে। ইহাই বিকাশময়ী চিদদেবীর দ্বিতীয় বিকাশ। পরম যোগী এই অবস্থাতে বীরেন্দ্র বা বীরেশ্বর নামে অভিহিত হয়। এইটি প্রকৃত ভোগের অবস্থা— ইহা পশুর ভোগ নহে, বীরের ভোগ। কারণ পশু জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিনকালে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোক্তা থাকে, তাহার তুরীয় অবস্থা নাই। কিন্তু এই যে ভোগের অবস্থার কথা বলা হইল ইহা তুরীয় দশা। এই দশাতে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিনকালেই তুরীয়ানন্দের উল্লাস-বিद्यমান থাকে। এইজন্তেই শিবসূত্রে “ত্রিতয়ভোক্তা বীরেশঃ” বলিয়া এই অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে। উৎপলাচার্য্য এই অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার শিবসূক্তোক্তে বলিয়াছেন—

“তৎ তদ্ ইন্দ্রিয় মুখেন সন্ততং

যুগ্মদ্ব্যর্চন রসায়নাসবম্।

সর্বভাবচষকেষু পুরিতে-

ধাপিবন্নপি ভবেয়ম্ উন্মদঃ ।”

ইহা একটি অদ্ভুত অবস্থা। এই যে ভোগ ইহাই শ্রীভগবানের অর্চনা। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাঁহার পূজারসায়নরূপ আসব যাবতীয় ভাবরূপ চষকে বা পাত্রে পূর্ণরূপে ভরিতে পারিলে একটা নেশার মত ভাবের উদয় হয়, ইহা তাহাই। চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখা অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা রূপ নামক ভাবে বা চষকে পূজারস পান করা ও তন্ময় হওয়া। কানে শব্দ শোনা, ইহাও তাহাই। এই ভোগই উপাসনা। ইহা জাগ্রতে হয়, স্বপ্নে হয়, সুষুপ্তিতে হয়, যখন যে ভাবে থাকা যায় সবই তাঁর পূজা। ইহা দুর্বলের কাজ নয়, ইহাই বীর ভাব। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন “যদ্ যৎ কস্মি করোমি তৎ তদখিলং শস্তো তবারাধনম্”—ইহা সেই অবস্থা।

ইহার পর বিষয় ভোগান্তে তৃপ্তি। তৃপ্তির পর অন্তর্মুখ দশার আবির্ভাব হয়। তখন গ্রাহ ও গ্রহণের স্থিতি আত্মসাৎ হয়। কে তখন তৃপ্ত হয়? করণেশ্বরী দেবীগণ। কখন তৃপ্ত হয়? বিষয় ভোগ ক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর। তখন কি হয়? করণেশ্বরীগণ চিদাকাশরূপী ভৈরবনাথের সঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া পূর্ণ অন্তর্মুখ হয়-তখন ঐ সকল করণেশ্বরীদেবী ও চিদভৈরবনাথ অভিন্ন হইয়া যায়। ইহাই তাঁহাদের আলিঙ্গিত হইয়া শয়ান ভাবের তাৎপর্য্য। যতক্ষণ ইন্দ্রিয় আকাজক্ষায়ুক্ত থাকে ততক্ষণ করণেশ্বরীগণ চিদাকাশনাথকে আলিঙ্গন করিতে পারে না।

ভাগ] জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণজলাভ-একটি দৃষ্টি ১৪৫

যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগাকাজক্ষা থাকে ততক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ৭২০০০ নাড়ী সক্রিয় থাকে। তখন আন্তর ও বাহ্য দ্বাদশান্তের মধ্যে একটা গতাগতির ক্রিয়া চলিতে থাকে। অন্তর্স্থিত গতিতে আন্তর দ্বাদশান্তে প্রবেশ হয় এবং বহির্স্থিত গতিতে বাহ্য দ্বাদশান্তের স্পর্শ হয়। এই দুটি সংঘট্ট স্থান। যখন এই দুই সংঘট্ট স্থানে সন্ধি হয় তখনই পরপ্রমাতৃপদ উন্মীলিত হয়। ঠিক এই প্রকার অবস্থা প্রমাণ ও প্রমেয়ের সন্ধিতেও ঘটিয়া থাকে। এই পরপ্রমাতৃদেবী পরসংবিৎরূপা তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন পরাসংবিৎ আপন তেজ ও দীপ্তির প্রভাবে মিত-প্রমাতাকে নিজ স্বরূপে মগ্ন করেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষজনিত ক্ষোভ নিবৃত্ত হয়, অপর দিকে তেমনি প্রমাণ ও প্রমেয়ের সংঘর্ষও নিবৃত্ত হয়। এইটি শান্ত নির্বিবকল্প অবস্থা। উৎপলাচার্য্য প্রভৃতির মতে এইটি আধ্যাত্মিক শিবরাত্রি। তখন চন্দ্রাদি সহকারে সূর্য্য ও অন্তর্মিত হন।

এই অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিলে যে বিশিষ্ট স্থিতিলাভ করা যায় তাহাতে দুইটি ভাগ আছে। একটি বাহ্য ও অপরটি আভ্যন্তরীণ। যেটিকে বাহ্য বলা হইল ঐটি স্বরূপের আচ্ছাদন আর দ্বিতীয়টি স্বরূপের উন্মীলন। এই স্থিতিকালেই যোগিগণের পরীক্ষা হয়। এই স্থিতিতে প্রমাণ প্রমেয় ভাব যেমন থাকে না, তেমনি প্রাণ ও অপানের ক্রিয়াও থাকে না। প্রথমটি জ্ঞানের বা মনের দিক এবং দ্বিতীয়টি প্রাণের দিক। দুইটি দিকই সমান রূপে শান্ত। শান্তগণের গুহ্য পরিভাষাতে একটা দিককে সূর্য্যের

দ্বারা এবং অপর দিকটিকে চন্দের দ্বারা ছোতনা করা হয়। চন্দ্র ও সূর্য্য সমরূপে অস্তমিত হওয়ার তাৎপর্য্য এই যে এই অবস্থায় জ্ঞান-জ্ঞেয় ভাবের তরঙ্গ থাকে না এবং প্রাণের চলাচলও শান্ত হইয়া যায়। এই স্থানটিকে যোগীদের পরীক্ষা স্থান রূপে নির্দেশ করার কারণ এই যে এখানে স্বরূপ অনুসন্ধান জাগাইয়া না রাখিতে পারিলে স্বরূপ ঢাকিয়া যায়, তখন মহামায়াতে প্রবেশ হয় বলিয়া স্বরূপ আবৃত হয়। এই অবস্থায় স্বরূপ অনুসন্ধান জাগাইয়া রাখিতে হয়। শিবরাত্রিতে যে জাগিয়া থাকিতে হয় তাহার ইহাই তাৎপর্য্য। শিবসূত্রের পরিভাষাতে এই জাগিয়া থাকাকেই উত্তম বলে—“উত্তমো ভৈরবঃ।” এইটি অনাখ্যাদশা নামে পরিচিত। স্বরূপ অনুসন্ধান ঠিক থাকিলে এই অবস্থায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপের বিকাশ ঘটিয়া থাকে—এইটি মহাবোম। এই বোমে চন্দ্র সূর্য্যের সঞ্চার নাই অর্থাৎ প্রাণ অপানের ক্রিয়া নাই এবং প্রমাণ প্রমেয়ের ক্রিয়াও নাই। ইহারই নামান্তর চিদাকাশ, কারণ ইহাতেই চন্দ্র সূর্য্য লীন হইয়া যায়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবা মাত্র যোগী কৃতার্থ হইতে পারে না, কারণ এইখানে আসিয়া সুষুপ্ত থাকিলে ইহাই মোহরূপে পরিগণিত হয় এবং জাগিয়া থাকিতে পারিলে ইহা নিত্য নিরাবরণ প্রকাশরূপে পরিগণিত হয়। জাগিয়া থাকার তাৎপর্য্য এই যে যোগীকে এই অবস্থায় নিজের সত্তা-বোধে সতর্ক থাকিতে হয়—অর্থাৎ অনাখ্যাদশাতে আত্মা নিজের সত্তাবোধ যদি বজায় রাখিতে পারে তাহা হইলে চিরদিনের জন্য আবরণ শূন্য প্রকাশের রাজ্যে উন্নীত হইতে সমর্থ হয়। আত্ম বিমর্শ

ভাগ] জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণত্বলাভ-একটি দৃষ্টি ১৪৭

না থাকিলে এই পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াও পতিত হওয়া অসম্ভব
নহে ।

এই মহাব্যোমের বর্ণনা প্রসঙ্গে উৎপলাচার্য্য বলিয়াছেন—
“তদা তস্মিন্ মহাব্যোমি প্রলীন শশিভাস্করে । সৌষুপ্তপদবৎ মূঢ়ঃ
প্রবুদ্ধঃ শ্রাদনাবৃতঃ ।” এই পর্য্যন্ত উদ্ধৃগতি লাভ করার পরেও
যোগীর চিন্তে শঙ্কার উদয় না হইতে পারে এমন নহে । কিন্তু
শঙ্কা উদিত হইলেও যোগী স্বাত্মানুসন্ধানরূপ প্রযত্নের দ্বারা তাহা
কাটাইতে পারেন । যদি এই প্রকার অনুসন্ধান না ঘটে তাহা
হইলে পতন অসম্ভব নহে । আত্মানুসন্ধান থাকিলে স্পষ্ট
দেখিতে পাওয়া যায় যে বিকল্পরূপী সমগ্র জগৎ তখন অন্তর্মুখ
পদে লীন হইয়া যায় । তখন আত্ম চরাচর গ্রাস করিয়া সেই
গ্রাসের উল্লাসে এক রসময় স্থিতিলাভ করে । এই স্থিতি
পরপ্রমাতৃ দশাতেই স্থিতি, অপর কিছু নহে । ব্রহ্মসূত্রে যে
“অন্তা চরাচর গ্রহণাৎ” বলিয়া আত্মাকে চরাচর সমগ্র বিশ্বের
গ্রাসকর্তারূপে বর্ণন করা হইয়াছে ইহা তাহাই । স্বরূপ
অনুসন্ধান না থাকিলে এই স্থিতিতে ঠিক বিপরীত অবস্থার উদয়
হয়, তাহা প্রমোদ বিলাস রূপে মিতপ্রমাতৃ ভাবের বিস্তার মাত্র ।

*

*

*

(২ খ)

মনে রাখিতে হইবে যে স্বরূপ গোপন ও স্বরূপ উন্মীলন এই
দুটি ব্যাপারই পূর্ণ দশাতে থাকে, কিন্তু গুরুকৃপার প্রভাবে স্বরূপ-

গোপনটি সমূলে উপসংহৃত হইয়া যায় অর্থাৎ মহামায়া নিবৃত্ত হয় ও বহিস্মুখী বৃত্তি বা সংসারচক্র স্বাভাবিকিতে অভেদ-জ্ঞানে পরিণতি লাভ করে এবং অন্তর্মুখ পদের আশ্রয়ে অদ্বয় স্বরূপে স্থিতি হয়। এই পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন হইলে ইহার পরের অবস্থা বিনা চেষ্টাতেই সংঘটিত হয়। তখন আর স্বরূপ গোপন হয় না এবং বাহ্যবৃত্তিও জাগে না। এই অবস্থাটির পারিভাষিক নাম 'ভাব-সংহার।' ইহা উন্নত অবস্থায় নির্বিকল্প আত্মসংবেদন উদিত হইলে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই স্থিতিতে আত্মস্বরূপভূত জ্বলন্ত অগ্নিরাশিতে ভাবময় সমগ্র বিশ্বের উপসংহার ঘটিয়া থাকে। পরাসংবিৎরূপা দেবীর মহিমায় তখন সকল প্রমেয়ের সমূলে উচ্ছেদ হয়। এই অবস্থায় একদিকে যেমন ভেদজ্ঞান থাকে না, অপর দিকে তেমনি হয় ও উপাদেয় বোধও থাকে না। তাই ইহা শঙ্কশূন্য ও কল্পনাশূন্য নির্বিকল্প স্থিতিরূপে বর্ণিত হয়।

কিন্তু তথাপি ইহা পূর্ণাহন্তা স্বরূপ নহে, কারণ সংস্কার থাকে বলিয়া অতি সামান্য হইলেও ইদন্তার লেশ তখনও থাকিয়া যায়। কোলগণ বলেন যে পাঁচটি সংবিৎ দেবীর দ্বারা প্রমেয়ের সমূল উচ্ছেদ হইলেও তাহার সংস্কারটা থাকিয়া যায়। সেইজন্য এই স্থিতিতে যোগীর এরূপ বিমর্শ হয় যে 'আমিই এ সব অভেদে অবভাসিত করিয়াছি' অর্থাৎ সংহার হইলেও সংস্কার থাকে বলিয়া সংহারের পরামর্শটা হয়। ইহার পর এই যে সংস্কার রূপ উপাধি ইহাও আর থাকে না। পরা সংবিতের এই রূপটি

ভাগ] জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণত্বলাভ-একটি দৃষ্টি ১৪৯

পূর্বোক্ত পাঁচটি রূপকেই আত্মসাৎ করিয়া প্রকাশমান হয়। যতক্ষণ সংস্কাররূপ উপাধি বিद्यমান ছিল ততক্ষণ কালের কলনাও কিছু কিছু ছিল, কিন্তু সংস্কার নাশের পর যে অহংভাবের উদয় হয় তাহা স্বভাবভূত অহম্। যোগীর ঐ সময়কার অনুভূতিতে 'সবই আমি' এই প্রকার পরামর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও কিন্তু যোগীর আত্মরূপী শিবের পূজারই একটি উচ্চ অবস্থা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উৎপলাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

‘তামগাধমবিকল্পমদয়ং

স্ব-স্বরূপমখিলার্থঘন্যম্।

আবিশন্নহমুমেশ সর্বদা

পূজয়েন্নমভিসম্ভবীয় চ।”

ইহার পরের স্থিতিতে পরাসংবিৎ যে রূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপের বিকাশ ও ঐ সব বিকাশের নিজ স্বরূপে বিলয়ন সম্পাদন করিয়া থাকে। এই অবস্থাটি সংহারের আরও গভীরতর অবস্থা। পূর্বের যে ভাব সংহারের কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রমেয় পর্য্যন্ত সংহারের নামান্তর, কিন্তু এইবার যে সংহারের স্বরূপ প্রকট হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ পর্য্যন্ত উপসংহৃত হইয়া গিয়াছে। মহাকল্পের পর যে সংহার হয় ইহা তাহারই অনুরূপ। এই সময়ে সমস্ত প্রমেয় ও প্রমাণ চিদ্রূপী দীপ্তিতে সম্যক্ প্রকারে লীন হইয়া যায়। এই স্থলে আচার্য্যগণ একটি বিষয়ে সম্ভাব্যমান শঙ্কার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বের সংহার ভূমির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত বর্তমান ভূমির তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উভয়

স্থলেই শঙ্কার উদয় হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু এই উভয় ভূমির স্থিতিগত পার্থক্য এই যে নিম্নভূমিতে ঐ শঙ্কা নিবর্তনের জন্য নিজের ব্যক্তিগত প্রযত্ন বা অনুসন্ধান আবশ্যক হয়। উহা থাকিলে শঙ্কা স্বভাবতঃ নিবৃত্ত হয়, আর না থাকিলে শঙ্কার নিবৃত্তি না হওয়ার দরুণ পতন ঘটে। উপরের ভূমিতেও শঙ্কা উঠিতে পারে বটে, কিন্তু উহা নিজের চেষ্টা ব্যতীতই আপনা আপনি কাটিয়া যায়। কর্তব্য অকর্তব্য বিচারই এখানে শঙ্কাপদের তাৎপর্য। এই ভূমিটি সদাশিব দশার অনুরূপ। এই অবস্থায় শঙ্কা ও গ্লানি উদ্ভিত হইলেও যোগীর বিদ্ব উৎপাদন করিতে পারে না। এই স্থিতিতে প্রমের সর্বতোভাবে বিলীন, তবে প্রমাণস্থিত প্রমেয়ের জীবনী শক্তিটা এখনও রহিয়াছে। এই জীবনী শক্তিটি আমাদের দার্শনিক পরিভাষাতে দ্বাদশ ইন্দ্রিয়রূপে বর্ণিত হয়। ইহাও আগম মতে সূর্য্যোরই একটি রূপ।

কিন্তু ইহার পরের অবস্থায় দ্বাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক সূর্য্য অহংকার রূপী পরমাদিত্যে লীন হইয়া যায়। এই অহংকারই প্রমাতা। ইহারই নামান্তর কোন কোন আগম অনুসারে 'ভর্গশিখা'। পরাসংবিতের আটটি রূপে শব্দাদি বিষয় রসের আত্মস্বরূপে কি প্রকারে লয় হয় তাহা জানা গেল। এই অবস্থায় সমস্ত কলার উপসংহার হইয়া শুধু পরমা কলা বা অমা কলাটি বর্তমান থাকে। ইহাই শিবকলা ও পরপ্রমাতরূপ।

(২ গ)

এই যে অহংকাররূপী পরম আদিত্যের কথা বলা হইল ইহা

ভাগ] জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণকলাভ-একটি দৃষ্টি ১৫১

কিন্তু পরিচ্ছিন্ন প্রমাতা, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। পরমাদিত্যের পর যে অহং সত্তার উদয় হয়, তাহা পরম আদিত্য হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থা বটে, কিন্তু তাহাও পরিচ্ছিন্ন প্রমাতাই বটে। ইহার পারিভাষিক নাম কালাগ্নিরূপ। ইহা পরমাদিত্যের উর্দ্ধে, কিন্তু তথাপি ইহা অমিত প্রমাতা নহে। ইহা একটি জনন্ত স্থিতি, সংসার দন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লেশমাত্র পশুত্ব তখনও রহিয়াছে। যোগীর এই স্থিতিতে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্কার মাত্রও থাকে না। একমাত্র ইন্দ্রিয়াতীত নির্বিকল্প প্রমাতাই প্রকাশরূপে বিद्यমান থাকে।

ইহার পর রুদ্রাবস্থা কাটিয়া যায়, রুদ্রাবস্থার অবসানে ভৈরব অবস্থার উদয় হয়। আদিত্যের পর রুদ্র এবং রুদ্রের পর ভৈরব, ইহাই ক্রম। ভৈরবের যে রূপ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে তাহার নাম মহাকাল ভৈরব। পরাংমুখে এইখানে মহাকালীরূপে প্রকাশিত হন। মহাকাল ভৈরব পঞ্চকৃত্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, অবশ্য নিরপেক্ষ ভাবে নহে, কারণ ইনিও স্বতন্ত্র নন। যাহার ইচ্ছায় ইনি সৃষ্টি আদি পঞ্চকৃত্য সম্পাদন করেন তিনি স্বয়ং জগদহা। এই অবস্থায় এই পরম তেজের গর্ভে সকল প্রকার পরিচ্ছিন্ন অহস্তা লীন হইয়া যায়। দেহগত অহস্তা, প্রাণগত অহস্তা, পুর্যুষকগত অহস্তা এবং শূন্যগত অহস্তা সব এই মহাগ্নিতে দন্ধ হইয়া একমাত্র বিশ্বের সহিত অভেদময় পূর্ণ অহস্তা বিद्यমান থাকে। যোগী এই অবস্থায় আসিলে পরম শিবের আয় পঞ্চকৃত্যকারী হইয়া থাকেন। তবে

পরম শিবের পঞ্চকৃত্য এই অবস্থায় ব্যাপিনী কলায় প্রকাশ হয় ইহা অনেকে বলেন। ইহার পর মহাকাল ভৈরবও থাকেন না— এইটি মহাভৈরবের অবস্থা। এইটি মহাকালের অতীত। এই স্থিতিতে সব কিছু শান্ত, কিছুই সংস্কার পর্য্যন্ত থাকে না। যে স্বাস্থ্যসংবেদন ক্রমশঃ অধিকারিক পরিশ্রুত হইতে হইতে বিকাশ পাইতেছিল এখানে তাহা পূর্ণ হয়। তখন মহাকালী ভগবতীও স্বধামে বা অকূলে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য উন্মুখ, তাই ইহা কালের দ্বারা কলিত অবস্থা নহে। এই অবস্থায় যোগী ব্যাপিনীর পর সমনাভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলা চলে। তখন সৃষ্টি সংহার রূপ কাল থাকে না, সাম্যরূপ কাল থাকে। তখন কালের সত্তা যেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ঐ অবস্থায় অনন্ত কাল ক্ষণমাত্র রূপে প্রতীত হয়। এই অবস্থার কথাই উৎপলাচার্য্য এই কারিকাটিতে বলিয়াছেন—

“ন সদা ন তদা ন চৈকদেতাপি সা

যত্র ন কালধী ভবেৎ ।

তদিদং ভবদীয় দর্শনং

ন চ নিত্যং ন চ কথ্যতে হ্যথা ।”

ইহার পর যে অবস্থা তাহাই ক্রমবিকাশের অন্তিম স্বরূপ— ইহা পরম শিবের অবস্থা। এইখানে পরাসংবিদ-দেবীর—স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। দেবী পূর্ণরূপা ও কুশরূপা এক সঙ্গে উভয়ই। ইনি অষ্টটন ঘটন পটীয়সী। যখন ইনি স্রাস্ত্রিত দেবীগণের উদয় করেন, প্রমাতা প্রমাণ প্রভৃতি সমস্ত পদের ও সৃষ্টি আদি সমস্ত চক্রের বিকাশ করেন, তখন ইনি পূর্ণা, আর যখন ইনি উহাদিগকে

ভাগ] জীবের আবির্ভাব ও পূর্ণত্বলাভ-একটি দৃষ্টি ১৫৩

নিজের স্বরূপে লীন করেন, শুধু একটি মাত্র কালসংকষিণী নামক চক্র অবশিষ্ট থাকে, তখন ইনি কৃশা নামে অভিহিত হন।

এই পরম স্থিতিতে ক্রম থাকে না, যৌগপদও থাকে না, ক্রমাক্রমের কোন সম্বন্ধই থাকে না। ক্রমবিজ্ঞানে দেবীর ক্রম বিকাশ হয়। মনে হয় এই বিকাশের ফলে প্রমেরাদি ক্রমশঃ স্বাত্মসংবিত্তিরূপে ভাসিতে থাকে।

ইহাই জীবের পূর্ণত্বলাভ। যে অথও স্বাতন্ত্র্যময় বোধরূপী সচ্চিদানন্দাত্মক পরব্রহ্ম বা পরম শিব আগম শাস্ত্রে জীবের আত্মসাধনার চরম লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ইহা সেই অবস্থা। মহাস্থিতিতে সবই থাকে অথচ কিছুই থাকে না এবং এই থাকা ও না থাকার বিরোধও থাকে না। সুতরাং জীব জগত ও ঈশ্বর সকলের সেই পরম স্বরূপ অদ্বয়রূপে প্রকাশমান হইলেও তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যও সেখানে অক্ষুণ্ণ থাকে। এই অবস্থায় পরমপ্রকাশ অথও বলিয়া ঘাবতীয় অবাস্তর ভেদ ইহার সঙ্গে অভিন্ন রূপেই প্রকাশ পায়। জীবের অনাদি কালের ত্রিতাপ জ্বালা এই পূর্ণত্বে অবগাহন করার পর চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ ইহাই পরমপদ।

শ্রীশ্রীগদ্‌ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বিষয়ক প্রকাশিত

পুস্তকাবলী

- ১। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৫ খণ্ড)—
 শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত
 প্রথম ভাগ—চরিত-কথা—১ (পুনর্মুদ্রিত)—১৮ টাকা
 দ্বিতীয় ভাগ—তত্ত্ব-কথা—১—১৮ আনা
 তৃতীয় ভাগ—লীলা কথা
 পূর্বার্দ্ধ—১—১৮ আনা
 উত্তরার্দ্ধ—১-২—১৮+১৮ টাকা
- ২। যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস—
 শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত—৫৮ টাকা
- ৩। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস রচিত গীতরত্নাবলী—
 শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত—১৮ আনা
- ৪। বিশুদ্ধবাণী—
 শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত
 প্রথম ভাগ—২৮ টাকা
 দ্বিতীয় ভাগ—২৮ টাকা
 তৃতীয় ভাগ—২৮ টাকা
 চতুর্থ ভাগ—২৮ টাকা
 পঞ্চম ভাগ—২৮ টাকা
 ষষ্ঠ ভাগ—২৮ টাকা
 সপ্তম ভাগ—২৮ টাকা
 অষ্টম ভাগ—২৮ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

কার্য্যকারক—

“বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম”

মালদহিয়া, বারাণসী।

